বঙ্কিম সমালোচনা

কপালকুণ্ডলা বা সখের-সতীন যুগলাঙ্গুরীয় বা সত্যসাধ্বী এবং ইন্দিরা বা ডাকিনী।

(দেশ হিতৈষণায় জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ।)

সপ্তাহের মধ্যে ফেরত দিলে মূল্য ফিরাইয়া দিব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

রাজবদ্ধির অর্জ্জন গোলামবদ্ধির বর্জ্জন।

রাজবুদ্ধি পড়লে ইহা বাড়বে জ্ঞানের জ্যোতি;
দাসবুদ্ধি পড়লে প্রাণে জ্বলবে বিষের বাতি।
তবে যদি পড়েন কেহ রাগ বর্জ্জন দিয়ে;
রাজবুদ্ধি লাভ করিবেন দাস বুদ্ধি হয়ে।

অনেক জ্ঞানী হিন্দুমুসলমানের সাহায্যে
ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন, এম, ডি
কর্ত্তৃক বিরচিত।

প্রথম সংস্করণ।

Printed and Published by—Syed Abul Hashem, B. A.
at Derbar Press, 63, Collin St. Calcutta.
1922.

মূল্য আট আনা

বঙ্কিম সমালোচনা

কপালকুণ্ডলা বা সখের-সতীন

যুগলাঙ্গুরীয় বা সত্যসাধ্বী এবং ইন্দিরা বা ডাকিনী।

(দেশ হিতৈষণায় জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ।)

সপ্তাহের মধ্যে ফেরত দিলে মূল্য ফিরাইয়া দিব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

রাজবুদ্ধির অর্জ্জন গোলামবুদ্ধির বর্জ্জন।

রাজবুদ্ধি পড়লে ইহা বাড়বে জ্ঞানের জ্যোতি;
দাসবুদ্ধি পড়লে প্রাণে জ্বলবে বিষের বাতি।
তবে যদি পড়েন কেহ রাগ বর্জ্জন দিয়ে;
রাজবুদ্ধি লাভ করিবেন দাস বুদ্ধি হয়ে।

অনেক জ্ঞানী হিন্দুমুসলমানের সাহায্যে
ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন, এম, ডি
কর্ত্তৃক বিরচিত।

প্রথম সংস্করণ।

Printed and Published by—Syed Abul Hashem, B. A.
at Derbar Press, 63, Collin St. Calcutta.
1922.

মূল্য আট আনা

৬।০/

কপালকুণ্ডলা বা সখের সতীন

—:•:—

১ * নভেল কাহাকে বলে ? * ১

নভেল সকল কাল্পনিক গল্পগ্রন্থ হইলেও উহাতে অনেক পরিমাণে সত্য থাকে। দেশাচারাদি ব্যক্তিগত হাবভাব ও ধর্ম্মগত দৃষ্টান্ত ; ভূমি বিশেষের, স্থানচয়ের, হর্ম্ম্যাদি নদনদী সমুদ্র প্রভৃতির এবং নরনারীর চিত্রাবলীতে সত্য থাকে।—যদি ইতিহাস বা ধর্ম্মপুস্তকের কিয়দংশ গ্রহণ করিতে হয়, তবে সেই অংশ ইতিহাসানুরূপ সত্য হইয়া থাকে। কোন বিশ্বরাষ্ট্র সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতে হইলে, তন্মধ্যে অলীক বলা অনুচিত। নভেলে লিখিত মানব মানবীরা, যে সকল হাবভাব, চালচলন, আচার ব্যবহার ধর্ম্মকর্ম্ম, পতিভক্তি স্ত্রীভালবাসা ও সতীত্বাদি তাহাদের স্বভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা ঐ শ্রেণীর মানবমানবীদের জাতিগত ও দেশগত ধর্ম্মকর্ম্মাদি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

যদি কোন অসার-কল্পীকবি চিত্রাঙ্কনকালে বলেন—'একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে কলিকাতা-হিন্দুকলেজের অবস্থিতি।' কিংবা—ভাগিরথী নদীর মধ্যভাগে জলবিস্তারের উপর কলিকাতার হাইকোর্ট বিরাজ করিতেছে।' অথবা 'বাণিজ্য-ব্যাপী কলিকাতা নগর, বঙ্গসাগরের তটদেশে অবস্থিত।' তবে, সেই কবি তাঁহার পাঠক সকলকে নিশ্চয়ই উদ্‌ভ্রান্ত করিতেছেন। কাজেই উহা নভেলের জন্য অলীক অসার, মিথ্যা ও নিতান্ত ভ্রান্ত্যুৎপাদী কল্পনা। এরূপ কবিদের পুস্তক স্কুল কলেজের পাঠ্য হইলে, ছাত্রবৃন্দ বিকৃতবুদ্ধি হইয়া পড়ে। যদি কল্পনায়, আকবর বাদশাকে ইংলণ্ডেশ্বর, ঔরঙ্গজেবকে রাবণপুত্র, সিরাজদ্দৌলাকে ক্লাইভ হন্তা বলিয়া দেখান হয়,

—যদি কোন অধম দস্যুকে রাজসম্মানে, দুষ্টা রমণীকে দেবীর ভূষণে, এবং অসৎ পুরুষকে দেবতার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করা হয়; তাহাতে পাঠকবর্গকে প্রকারান্তরে বলা হয়,—'তোমরা ঐরূপ নীচ ও হীনজাতি, তাই ঐরূপ দুষ্টদিগকে দেবতা দেবী বলিয়া পূজা কর, তোমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম জ্ঞানগুণাদি ঐরূপ অশিষ্ট ও নিকৃষ্ট।'

সত্যের অনুরূপে অথচ কাল্পনিক কথায় নভেল রচিত হইয়া থাকে। সুকল্পী কবির নভেল পড়িয়া কোন পাঠকই বুঝিতে পারিবে না যে, এইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে না বা ঘটা অসম্ভব। অসম্ভবকে সম্ভব এবং অসঙ্গতকে সঙ্গত করিয়া দেখান ও গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত সামঞ্জস্য রাখাই কবির সুকল্পনা। প্রদীপ ঘষিলে শতশত ভূতপেত্নীর আবির্ভূতি, মেঘের পার্শ্বে দেবীদের আমদানী, তন্ত্রমন্ত্রাদি ভৌতিক কথা সকল নভেলে শোভা পায় না। ইতিহাসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা বা কোন সত্য ঘটনাকে মিথ্যা করিয়া দেখান, পরম অধর্ম্মাচারী সম্পাদক ও কবিবর্গের কার্য্য। কোন জাতিগত বা ধর্ম্মগত কাহিনী যেমন রামবনবাস, সীতাহরণ, সাবিত্রীচরিত্র ও কারবালার যুদ্ধাদি নভেলে স্থান পাইতে পারে না। রামকে দ্রৌপদীর স্বামী এবং লক্ষ্মণকে সীতাপতি বলিলে, ঐ মনস্বিগণের ভক্ত ব্যক্তিদিগকে গালাগালি করা হয়। কোন নির্ব্বল ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে 'বীর বলিয়া' উল্লেখ করিলে সেই সম্প্রদায়কে উদ্‌ভ্রান্ত ও উত্তেজিত করা হয়। এবং সেই ধারণা কল্পনামধ্যে পোষণ করিলে, কোন না কোন সময়ে সেই জাতির ভয়ানক অমঙ্গল ঘটে এবং তাহাই ঘটিতেছে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, 'কাল্পনিক গল্পের যখন আদ্যোপান্ত মিথ্যা, তখন তার মধ্যে যেমনই মিথ্যা বলা হউক না কেন, তাহা দোষনীয় হইতে পারে না। সেরূপ লোকেদের জানা উচিত যে, একজন উকিল আদালতের মাঝখানে বিচারপতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া (অর্থাৎ যেখানে একটি মাত্র মিথ্যা বলিলে দণ্ডগ্রহণ করিতে হয়) মওয়াক্কেলের পক্ষ হইতে শতসহস্র মিথ্যা বলিয়াও অপরাধী নহেন। (বরং যিনি তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিবেন তিনিই অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন।) কারণ, এইরূপ মিথ্যা বলা উকিলদের সীমার অন্তর্গত। আর যদি সেই উকিলকে পঞ্চায়েৎ বা সাক্ষীরূপে গ্রহণ করা হয়, আর তখন যদি মিথ্যা সাক্ষী দেন, তবে তিনি একের স্থলে সহস্র অপরাধে অপরাধী, মিথ্যাবাদী, পক্ষপাতী, অধর্ম্মাচারী ও দণ্ডোপযোগী বলিয়া সাব্যস্ত ও বিঘোষিত হইবেন।—কবিরাও যদি তাঁহাদের কল্পনা স্বীয় গণ্ডীর

নিষ্ঠীবনের পাত্র। পাঠকদিগকে উপদেশ দিবার মানসে যদি কোন কবি কটুভাষা ব্যবহার করেন, দূরদর্শী পাঠকেরা তাহা গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাত মনে করিয়া থাকেন। এবং তুষ্কল্লী কবিদের পক্ষপাতিত্ব করা নিতান্ত হীনবুদ্ধি পাঠকদের কার্য্য।

২ ❋ জংলী জায়া। ❋ ২

সম্রাট আকবর বাদশার শাসনকালে, হুগলির নিকটবর্ত্তী সপ্তগ্রাম নামক নগরীতে নবকুমার নামে এক যুবক বাস করিতেন। তাঁহার সংসারে এক বিধবা মাতা এবং দুই ভগ্নী ছিল। জ্যেষ্ঠাভগিনী শ্যামাসুন্দরী, তিনি কুলীন পত্নী, অতএব সধবায় বিধবা এবং কনিষ্ঠা গৌরীমণি, তিনি বিধবা। নবকুমার, রামগোবিন্দ নামক এক ব্যক্তির কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ রামগোবিন্দ সপরিবারে, আকবর বাদশার একদল সেনা কর্তৃক ধৃত হইয়া পড়েন, এবং তখন তাঁহারা সেনাদলের সম্মুখে দাম্ভিকতা দেখাইবার কারণে; সেনাদল তাঁহাদিগকে দিল্লী পাঠাইয়া দেয়। সেখানে তাঁহারা স্বেচ্ছায় এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

(নভেল ঠাকুর মুসলমান দেখিলেই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া, পূতবদন পূতিগন্ধি করিয়া থাকেন, এস্থলে আকবর বাদশার এতদূর ধৃষ্টতা ও অন্যায়াচরণ দেখিয়াও, ঠাকুর যে কেন মৌনাবলম্বন করিলেন তাহা একটা চিন্তার বিষয় নহে কি ?—ঠাকুর এখানে নিশ্চয় লুকাইয়া কলা খাইয়াছেন।) যাহা হউক রামগোবিন্দ মুসলমান হইবার কিছুদিন পর, সপ্তগ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু নবকুমার কিছুতেই পদ্মাবতীকে গ্রহণ করিলেন না, এবং সমাজ তাঁহাদের সকল প্রায়শ্চিত্ত অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদিগকে রহিত করিয়া রাখিল। অধিকন্তু নবকুমারকে কেহই কন্যা-দান করিতে চাহিল না। এইজন্য, চিরপ্রখরা পদ্মাবতী সপ্তগ্রামের হিন্দুদের প্রতি রোষানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু কার্য্যে কিছুই করিতে পারিলেন না। অগত্যা তিনি পুনরায় দিল্লী গমন করিলেন। নবকুমার সকলদিক হারাইয়া মনের দুঃখে, সংসার ত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে, তাঁহার কনিষ্ঠাভগ্নী গৌরীমণি চুরি যায়। (নভেলঠাকুর এ কথা গোপন করিয়া, বলিয়াছেন—'পাঠক, আপনাদের সহিত শ্যামাসুন্দরীর সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু নবকুমারের কনিষ্ঠাভগ্নীর

নবকুমার, জগন্নাথক্ষেত্র দর্শন করিয়া, নৌকারোহণে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। (এমন সময়ে, নভেল ঠাকুর, তাঁহার মহামন্ত্র আওড়াইলেন—অমনি আকাশমণ্ডল মেঘাবৃত হইল। হুহুরবে মেদিনীকম্পী ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল। নবকুমারের নৌকা ভাঙ্গিয়া গেল। ব্রজেশ্বর নামক একজন বলবান্ আরোহীর সাহায্যে মাঝিরা অনেক যত্নে, নৌকাটীকে হিজলীর বালী আড়ির দিকে, কিনারায় আনিতে সক্ষম হইল। গতরাত্রি উপবাসে কাটিয়াছে, অদ্য সুপ্রভাতে অন্নাদি পাকের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। নৌকায় চাল, দাল সকলই প্রস্তুত ছিল, কিন্তু ইন্ধনকাষ্ঠ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ঝড় তুফানের সময় কেহ তাহা জলে ফেলিয়া দিয়া থাকিবে। যাহা হউক জঙ্গল নিকটে কাষ্ঠের অভাব হইবে না, তবে, বাঘের ভয়ে কেহ বনে যাইতে সাহস করিল না।

ব্রজেশ্বরের উত্তেজনায়, নবকুমার কুঠারাদি লইয়া, সাহস করিয়া একাই সেই জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। এবং বনের ভিতর যাইয়া, কাঠ কাটিতেই উন্মত্ত হইয়া গেলেন। তীর্থে আসিয়া সে দিকে যেমন বাড়ীর বিধবা কয়টিকে ভুলিয়া আছেন, তেমনি এ দিকে কাঠ কাটিতে গিয়া, নৌকার সঙ্গীদের কথা ভুলিয়া গেলেন। শেষে, গোবিন্দলাল তাঁহার অনুসন্ধানে গমন করিল। এবং 'ঐ বাঘ' বলিয়া বন হইতে একবার মাত্র চিৎকার করিয়া নীরব হইয়া গেল। নৌকার লোক তাহাতে ভয় পাইয়া, নবকুমার এবং গোবিন্দকে বাঘে খাইয়াছে মনে করিয়া, নৌকা লইয়া পলায়ন করিল। নবকুমার বোধ করি বেলা তৃতীয়প্রহরে ফিরিলেন। সমুদ্রতীরে আসিয়া নৌকা দেখিতে পাইলেন না।

সমস্ত দিন গেল, হিমপ্রসবিনী অন্ধকার রজনী লইয়া, কালসন্ধ্যা আগমন করিল। নবকুমার অনাহার ও অনাবৃত অবস্থায় যৎপরোনাস্তি কষ্টে সেই তুষারবর্ষী রজনীর প্রভাত করিলেন।—পাঠক বুঝিয়াছেন কি, আমরা এখন কোথায়?—ভাগিরথী নদীর মোহনায়, সুবর্ণরেখা নদীর আরও উত্তরপূর্ব্ব ভাগে; যেখানে এখন রঘুনাথপুর, কুমিরদাহ, কাঁথি ও কাউথালি আদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর দেখা যায়, আমরা এখন সেই স্থলে। তখন ঐ সকল স্থল বালুকাময় কান্তার প্রদেশপ্রায় ছিল। বালুকাস্তূপ সকল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধবলাগিরিপ্রায় গায়ে গায়ে পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত

অগ্নি দেখিয়া, সেইদিকে গমন করিলেন। এবং তথায় যাইয়া এক সন্ন্যাসীকে দেখিলেন। তাঁহার সম্মুখে কালীমাতা এবং তিনি এক শবের উপর বসিয়া, মায়ের ধ্যানে মগ্ন আছেন। ক্ষুধার্ত্ত নবকুমার অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর, সন্ন্যাসী তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। পরন্তু নবকুমারের বৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়া, তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া, নিকটবর্ত্তী এক পর্ণকুটীরে লইয়া গেলেন। এবং তাঁহাকে তথায় বসাইয়া বলিলেন। "আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, তুমি কোথাও যাইও না।"

নবকুমার বসিয়া রহিলেন। পর্ণকুটীর হইতে এক কাঁচাহলুদবর্ণা ষোড়শী রূপসী আসিয়া তাঁহাকে কিছু খাইবার সামগ্রী দিলেন। সামান্য আলাপ পরিচয়ে জানা গেল যে, দস্যুরা ঐ কন্যাকে অপহরণ করিয়া সমুদ্রতীরে ফেলিয়া যায়; এই সন্ন্যাসী বা কাপালিক তাহার নাম কপালকুণ্ডলা রাখিয়া, সযত্নে প্রতিপালন করিতেছেন। (এই কুড়ান কন্যাটিই ঠাকুরের পুঁজি।)

তৃতীয় প্রহরে, কাপালিক, নবকুমারকে সঙ্গে লইয়া, কালীমাতার নিকট গমন করিলেন। এবং তথায় আসিয়া, দেবীর সম্মুখে তাঁহাকে, স্বীয় ভুজবলে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া, রজ্জু দিয়া তাঁহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি পরম ভাগ্যবান! আজ তোমাকে বলি দিয়া মাতৃপদ পূজা করিব। তুমি ভক্তি সহকারে মায়ের আরাধনা করিতে থাক।" এই বলিয়া কাপালিক তরবারির অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু খুঁজিয়া না পাওয়ায় মনে করিলেন, কপালকুণ্ডলা তাহা পর্ণাবাসে লইয়া গিয়াছে। তিনি তরবারির জন্য পর্ণাবাসের দিকে গমন করিলেন।

নবকুমার তাঁহার জীবনে হতাশ হইয়া, মনে মনে স্বদেশবাসী, বন্ধুবান্ধব, স্নেহময়ী জননী এবং ভগিনীদ্বয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। 'মায়ের কি হইবে, ভগ্নীরা কোথা যাইবে' এই সকল চিন্তা লইয়া নয়নজলে ভাসিতে রহিলেন; এমন সময়ে অন্যপথ ধরিয়া, কপালকুণ্ডলা তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হস্তে একখানি তরবারি ছিল। তিনি সেই শাণিত অস্ত্রাঘাতে নবকুমারের বন্ধনগুলি কর্ত্তন করিয়া ভয়ভরা শব্দে কহিলেন। "যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাও, সত্বর আমার সহিত চলিয়া আইস।"

অন্ধকারে তাঁহারা পথ পর্য্যটন করিতে করিতে, অনেক দূরে এক দেবমন্দিরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারদেশে আঘাত করিতে মন্দির সেবক দ্বার খুলিয়া দিলেন। কপালকুণ্ডলা, সেই সেবকসমীপে নবকুমারের সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। সেবকঠাকুর দয়ার্দ্রচিত্তে কহিলেন। "তোমার কথায় আমি যেন নবকুমারকে দুই এক দিন আমার মন্দিরে স্থান দান করিলাম, কিন্তু মা, তোমার দশা কি হইবে? তুমি যে কাজ করিয়াছ, কাপালিক কিছুতেই তোমাকে জীবিত রাখিবে না। আমি বলি, কল্য প্রভাতে তুমিও এই যুবকের সহিত চলিয়া যাও। আমি তোমাদিগকে মেদিনীপুরের পথ পর্য্যন্ত পৌছিয়া দিব। তুমি নববয়স্কা অনূঢ়া বালিকা, আমার ইচ্ছা, তুমি যুবককে বিবাহ করিয়া উহার সহিত পলায়ন কর; তাহা হইলে এইরূপ গমনে তোমার সতীত্বে কোন দোষ জন্মিবে না।"

শিশুরা যেমন হিজিবিজি লিখিতে লিখিতে, মাঝে মাঝে দুই একটা অক্ষরও লিখিয়া ফেলে, নভেল ঠাকুরের হিজিবিজি কল্পনার মধ্যে, তেমনি দুই একটি সুন্দর কল্পনা এইস্থলে দেখিতে পাইয়াছি। তিনি বলিতেছেন (আমরা বলি নাই।) কপালকুণ্ডলা তাহার বাল্যাবধি বনে বাস করিতেছে; লোকালয় কখনও দেখে নাই। 'বিবাহ' কাহাকে বলে, সে তাহা জানিত না। সেবকের মুখে বিবাহ শব্দ শুনিয়া অবাক হইয়া রহিল। কতক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করিল। "বি-বা-হ, তোমাদেরই মুখে শুনি, সে আবার কি!"

সেবক তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন। "বিবাহ স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম। না করিলে নারীধর্ম্ম রক্ষা পায় না। (তাই বুঝি পাছে বিধবার ধর্ম্ম রক্ষা পায় সেইজন্য বিধবাবিবাহ নাই।) সকল নারীই বিবাহ করে, তুমি নবকুমারকে বিবাহ কর!" সেবক এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভাবিলেন তাঁহার যথেষ্ট বুঝাইয়া বলা হইয়াছে। কপাল-কুণ্ডলাও ঐ পর্য্যন্ত শুনিয়া মনে করিল, সেও বুঝিয়া গিয়াছে। সে ভাবিল 'যেমন দেবদেবীর পূজা করিলে পুণ্য হয়, তেমনি স্বামী পূজা করা, স্ত্রীলোকের জন্য পুণ্যের কার্য্য।' বলিল।—"তা করিব, তাতে আমাকে কি করিতে হইবে বল।"

সেবক নবকুমারকেও বুঝাইয়া বলিলেন। এবং কপালকুণ্ডলা যে ব্রাহ্মণকন্যা, তাহার সাক্ষ্য দিলেন (বোধ হয় চোরেরা ঐ বালিকাকে নদীতীরে ফেলিয়া যাইবার সময় সেবক ঠাকুরকে সেই কন্যার পরিচয় দিয়া গিয়াছিল। নচেৎ সে ব্রাহ্মণকন্যা কি না, তাহা তিনি কেমন করিয়া জানিবেন। সে যে কেমন করিয়া জানিল তাহা

আমরা পরে বলিব। অলীকভাষীরা কথা গোপন করিতে চাহিলেও, যে ভাবে তাহার মুখ দিয়া সত্যগুলি প্রকাশ পাইয়া যায়; এখানে ঠাকুরের লেখনী সেই ভাবেই সত্য কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে।) নবকুমারও পদ্মাবতীকে হারাইয়া অবধি গৃহশূন্য রহিয়াছেন। সহজেই বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন। সেবকঠাকুরের যত্ন পরিশ্রমে সেই রাত্রেই, নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলায় বিবাহ হইয়া গেল। পরদিবস প্রত্যূষে উঠিয়া সেবকঠাকুর তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া, মেদিনীপুরের রাজপথে তুলিয়া দিলেন। এবং নবকুমারের হাতে কিছু অর্থ দিয়া বলিলেন, "কপালকুণ্ডলাকে পাল্কী করিয়া লইয়া যাইও।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এক স্থলে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

৩ ❋ সতীনে সতীনে। ❋ ৩

নবকুমার সেই অর্থে একখানি পাল্কী ভাড়া করিলেন। কপালকুণ্ডলাকে তন্মধ্যে বসাইয়া লইয়া, নিজে বাহকদের পশ্চাতে দৌড়িয়া চলিলেন।—উড়েদের পালক না থাকা সত্ত্বেও লোকে বলে 'উড়িয়া যাইতেছে।' কাজেই তাহারা নবকুমারকে পশ্চাতে রাখিয়া দৌড়িল। তবে কথা ছিল যে, সন্ধ্যাগমনে নিকটবর্ত্তী কোন এক চটীতে যাইয়া বিশ্রাম লইবে।

নবকুমার ক্রমশঃ অনেক পশ্চাৎ পড়িয়া গেলেন, পথেই তাঁহার সন্ধ্যা হইল। (নভেল ঠাকুরের কল্পনার পুঁজি ফুরাইয়া গেল, আর তাঁহার মৎলব খেলেনা। সেহেতু এই সময়ে আবার) আকাশমার্গে তাঁহার মেঘ দেখা দিল, অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল, স্বল্পাধিক বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। নবকুমার সেই অন্ধকারে, সেই জনশূন্যপথের পার্শ্বে একটা ঝোপের মত কি দেখিলেন। সামান্য অগ্রসর হইতেই এক শবদেহ দেখিতে পাইলেন। তারই নিকটে এক ভগ্ন পাল্কী। ভাবিলেন দস্যুরা তাঁহারই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। পাল্কীর পার্শ্ব হইতে এক রমণীকণ্ঠজাত শব্দ শোনা গেল। অগ্রসর হইতেই দেখিলেন, পাল্কীর সহিত এক রমণীকে বাঁধিয়া দস্যুরা তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। সে রমণী কপালকুণ্ডলা

রমণীকে তথায় রাখিলেন। সেই চটির অন্য এক কামরা ভাড়া লইয়া, ইতঃপূর্ব্ব হইতে কপালকুণ্ডলা তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন।

ক্ষণকাল পরই এই অভিনব রমণীর দাসদাসীরা বাক্সাদি বহু বোচকাবুচকি লইয়া সেই চটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে প্রধানা পরিচারিকার নাম পেশমান, পেশমানের স্বামী সোলেমান; তাহার সহোদর হোসেনী এবং আরও কয়েকজন ছিল। (নভেল ঠাকুর পেশমান ছাড়া বাকি সকলের নাম গোপন করিয়াছেন।) অভিনব রমণী, নিজকে মোতিবিবি বলিয়া নবকুমারের নিকট পরিচয় দিলেন। (ঠাকুর উহার আসল নাম লুৎফুন্নিসা বলিয়াছেন।)

দিল্লী ও আগ্রার খানাজিম ও ওমরাহদের মধ্যে যে সকল বিখ্যাত বাই ছিলেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন কি না তাহা বলা যায় না। তবে যোধাবাই বেগমের এক প্রিয় পরিচারিকার নাম ছিল পদ্মাবতী, ইনি সেই হইবেন। ঠাকুর যেমন ওস্‌মানখাঁকে কতলুখাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং আয়েশাকে তাঁহার কন্যা বলিয়া, দুর্গেশ-নন্দিনীতে দেখাইয়াছেন; এখানে তেমনি, নবকুমারের পত্নী পদ্মাবতীকে লুৎ-ফুন্নিসা বলিয়া আমাদের চক্ষে ধুলী দিয়াছেন। আবার দেখিব ঠাকুর এই বঙ্গনারীকে কল্পনায় দিল্লীর পাঠরাণী করিতে দাঁড়াইবেন এবং তদ্দ্বারা তিনি তাঁহার, পাঠকগণকে অলীকে স্ফীত করিয়া তুলিবেন। তাঁহারাও সগৌরবে বিশ্বাস করিয়া লইবেন যে, একটা অতি তুচ্ছ বঙ্গরমণীও দিল্লীর পাঠরাণী হইবার, জ্ঞান গুণ, বিদ্যা বুদ্ধি, আচার ব্যবহার ও সভ্যতাদি দূরদর্শিতায় উপযুক্ত হইয়া থাকে। একদিকে ঠাঁকুর পদ্মাবতীকে পাঠরাণী করিতেছেন, অপরদিকে বলিতেছেন;—"পদ্মাবতী বিবাহ করিলেন না, তিনি শতপুষ্পের ভ্রমরী হইয়া কাননে কাননে পরিভ্রমণ করিতে লাগি-লেন। পিতার অবাধ্য হইলেন। (এ সকল বুঝি সম্রাটি আক্কেল?) আবার সেই পদ্মাবতীকে যখন নবকুমারের সহিত মিলাইবার চেষ্টা করিলেন, তখন বলিলেন; "তিনি শতপুষ্পের ভ্রমরী হওয়া সত্বেও সতী ছিলেন।" (ইনিই আবার মৃণালিনী গ্রন্থে বলিয়াছেন। "স্ত্রীলোকের সতীত্বের অধিক আর ধর্ম্ম নাই; যে স্ত্রীর সতীত্ব নাই সে শূকরী অপেক্ষাও অধম। সতীত্বের হানি কেবল কার্য্যেই, এমত নহে; স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তামাত্রও সতীত্বের বিঘ্ন। ইত্যাদি।" তাই ভাবি ঠাকুর একানন না দশানন? যে স্ত্রীর সতীত্ব নাই সে শূকরী, আর যে পণ্ডিত দ্বিবিধ

চটীতে আসিয়া নবকুমারের সকল চিন্তা দূর হইল। তিনি সকল কাজ সারিয়া মোতীবিবির নিকট আসিয়া বসিলেন, এবং ঘনদৃষ্টিপাতে তাঁহার রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে পদ্মাবতী বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। পাছে তাঁহাকে চিনিয়া ফেলেন, সেই আশঙ্কায়, মোতী নবকুমারকে লজ্জাবনত করিয়া দিবার জন্য, বলিলেন। "আপনি আমার মুখে কি দেখিতেছেন, আমার মত রূপবতী, আর কি আপনি দেখেন নাই?" (নভেল ঠাকুর এইস্থলের চিত্রখানি অতি সুন্দরভাবে আঁকিয়াছেন। এবং নবকুমারের মোটাবুদ্ধিটাও বেশ ভাবে ভাবে দেখাইয়াছেন। ঠাকুরের হিজিবিজি কল্পনার মধ্যে এ অক্ষরটিও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, ঠাকুরের এইরূপ দুই একখানি চিত্রের জ্যোতি, তাঁহার পতঙ্গবুদ্ধি পাঠকদের জন্য কাল হইয়া পড়ে। তাহারা তখন প্রদীপদর্শী সর্পের ন্যায় সাপুড়িয়ার মুষ্টিমধ্যে মস্তক সমর্পণ করিয়া বসে।)

মোতীবিবি কপালকুণ্ডলাকে দেখিবার জন্য উৎসুকা হইলেন। উত্তমরূপে বেশভূষা ও গহনাদি পরিয়া, কপালকুণ্ডলার কক্ষে গমন করিলেন। এবং স্বীয়গহনাগুলি খুলিয়া তাহাকে পরাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মোতিবিবি সে রাত্রিটা আমোদেই প্রভাত করিলেন। এবং পরদিবস প্রভাতে বিদায় লইয়া বর্দ্ধমানাভিমুখে সদলবলে যাত্রা করিলেন। নবকুমারও স্বীয় গৃহাভিমুখে গমন করিতে করিতে আবার বাহকদের পশ্চাতে পড়িলেন। (ঠাকুরের হিজিবিজি কল্পনার মধ্যে দুইটি মাত্র অক্ষর ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তারপর আর অক্ষর নাই কেবল হিজিবিজি, কেবল হাঁড়ি কলসী, মালসা সরা, জালা গামলায় পরিপূর্ণ।)

ঠাকুর বলিতেছেন, এক ভিক্ষুক কপালকুণ্ডলার পাল্কীর পশ্চাতবলম্বন করিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিল। বননিবাসিনী কপালকুণ্ডলার নিকট পয়সা ছিলনা। তিনি সেই মোতিবিবি প্রদত্ত গহনাগুলি মায় বাক্স সেই ভিক্ষুককে দান করিলেন। (কপালকুণ্ডলাকে দিয়া এইরূপ অজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করাইয়া, ঠাকুর প্রমাণ করিতে চাহেন যে, কপালকুণ্ডলা বনমধ্যে প্রতিপালিতা হইবার কারণে, তিনি অলঙ্কারাদির কোনই মূল্য জানিতেন না। কিন্তু ইহা তাঁহার স্থূল বুদ্ধির পরিচায়ক মাত্র। একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুর হাতে একখানি চক্‌চকে গিনি দিয়া, আবার তাহার হাত হইতে তাহা কাড়িয়া লইবার পূর্ব্বে যিনি লেখকের এই কল্পনার প্রশংসা করিবেন, জানির তিনি

করেন নাই। তাই অনুকরণাভাবে এ চিত্রটি ফলাইতে পারেন নাই। অথবা কপালকুণ্ডলা বাস্তবিক বনকন্যা নহে, তাহাকে বনকন্যা করিয়া দেখাইবার মানসে ঠাকুর এস্থলে ঐরূপ বাহুল্য কল্পনার স্থান দিয়াছেন।

৪ ❋ ঠাকুরের ঘণ্ট। ❋ ৪

নবকুমারের এই এক মহা আতঙ্ক ছিল যে, কপালকুণ্ডলাকে, গৃহে লইয়া গেলে তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও পাড়ার পাঁচজন, হয় তো ঐ কুড়ান কন্যাকে গৃহে স্থান দিতে আপত্তি করিবেন। (তালুকঠাকুর তাঁহার সাতখানি তালুক ঐরূপ কুড়ান ও জগৎগস্তানী কন্যায় যেমন—সূর্য্যমুখী, শৈবলিনী, শ্রী, রমা, মনোরমা, রোহিণী আদিতে, ভরিয়া ফেলিয়াও, এস্থলে বিশ্বব্যাপী হিন্দুয়ানী-সংস্কার দেখাইতেছেন।)

নবকুমারের নৌকার সঙ্গীরা দেশে আসিয়া বলিয়াছিল যে, নবকুমারকে বাঘে খাইয়াছে। বাঘটা কতবড়, তার ল্যাজ কত লম্বা ইত্যাদি, ঠাকুর যেরূপে বিবৃত করিয়াছেন, তাহা ঠাকুরের অবিকল আক্কেলের উপযুক্ত হইয়াছে। আর সেই সঙ্গীবুড়াটা নৌকায় বসিয়া ধানকাটা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল, তাহাও ঐ বুদ্ধিগত হইয়াছে। ঠাকুর যদি ঐরূপ সকল স্থলে সত্যের সাপেক্ষ হইতেন, তাহা হইলেও, আজ তাঁহাকে হৃদয় মন্দিরে রাখিয়া পূজা করিতাম।)

নবকুমার সপত্নীক গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মাতা ও জ্যেষ্ঠাভগিনী যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইয়া গেল। পুত্রবধূকে সযত্নে গ্রহণ করিয়া জননী, গৌরীর জন্য রোদন করিতে লাগিলেন। (ঠাকুর গৌরীর কথা হজম করিয়াছেন, আমরা খুলিয়া বলিতেছি।)

নবকুমার অবাক হইয়া বলিলেন। "গৌরী কি হইয়াছে?" জননী বলিলেন। "বাবা! কে তাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তুমি ঘরে না থাকায় এই ঘটিল। যাহাহউক, তার আর অনুসন্ধানে কাজ নাই।—হরকৃষ্ণের মেয়েরই মত বধূটি বেশ টুকটুকে পাইয়াছি। হ'ক বুনোমেয়ে, মেয়েটি ভাল।" শ্যামাসুন্দরী বলিল। দেখনা মা, আমি উঁর তরঙ্গময় কেশ আড়িয়া, কেমন সুন্দর খোঁপা বাঁধিয়া দিই।

যাহাহউক সেই কুড়ানকন্যা কপালকুণ্ডলা, ইতর, মেথর, ডোম চামার বা কাহার কন্যা, সে কথার কোন তত্ত্বাবধান না করিয়া, সেই সেবক ঠাকুরের কথামত, তাহাকে ব্রাহ্মণকন্যা মনে করিয়া, পবিত্র ব্রাহ্মণাবাসে স্থান দিয়া রাখিলেন। শ্যামাসুন্দরী কপালকুণ্ডলাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি তাহার নাম ফিরাইয়া মৃন্ময়ী রাখিলেন। (নাম ফিরাইলেন কেন?)

(ঠাকুরের ১৪ খানি গ্রন্থতেই দেখিতে পাই, তিনি কৃষ্ণকায় মেঘমালার উপর স্বীয় শিল্প কৌশলবলে এমন এমন কারুকার্য ও লতাপাতাপুষ্পজড়িত বিজলী অক্ষরে, হিন্দুসম্প্রদায়ের কুৎসা ও নিন্দা কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং কাবাড়ি নিকৃষ্ট ভাষায় গালাগালি দিয়াছেন যে, সাধারণচক্ষে সেই বিজলীজড়িত লেখাগুলি, হিন্দু দেবদেবীর উজ্জ্বল আলেখ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এবং তাহার দর্শনে হিন্দুর অন্তর, জাতীয় অহঙ্কারে, ধর্ম্মের গৌরবে ও দর্পের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। ভায়ারা যদি একবার টেলিস্কোপ লইয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সকল ভ্রমের অপনোদন হয় এবং জানিতে পারেন, ও চাক্ষুষ দেখিতে পান যে, ঠাকুর তাঁহাদিগকে কিরূপ কুৎসিত ও দুর্গন্ধময় নালায় ফেলিয়া ডুবাইয়াছেন, আবার সেই অঙ্গে রাঙের অলঙ্কার পরাইয়া কেমন ছেলে ভুলান করিয়া নিজে প্রশংসনীয় হইয়াছেন। ঠাকুরের কল্পনায় ডবল ইঞ্জিনের ফোর্স দেখা যায়।)

পদ্মাবতীর মুসলমান হওয়াই এই গ্রন্থের মূলমন্ত্র। পদ্মা মুসলমান হইলেও নবকুমারকে ভুলিতে পারেন নাই। এবং তাঁহাকে হস্তগত করিবার মানসে, আগ্রার ওমরাহদের মধ্যে কাহাকেও বিবাহ করেন নাই। নবকুমারকে পাইবার জন্য তিনি যে সকল অভূতপূর্ব্ব কৌশল খেলাইয়া তাঁহাকে মুসলমান করিয়াছিলেন, তাহাই এই গ্রন্থের পঞ্জরাস্থি। ঠাকুর তাহা লুকাইবার জন্য গ্রন্থের এই স্থল হইতে শেষ পর্য্যন্ত, কেবল হিজিবিজি কল্পনায় পূর্ণ করিয়াছেন। সত্য কথাগুলি গোপন করিবার জন্য অবিরত এক কল্পনা হইতে অন্য কল্পনায় লাফালাফি করিয়া মরিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন।—"কপালকুণ্ডলা তাহার সেই বনজাত স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সে কেশবিন্যাস করিত না, ভাল বস্ত্র পরিত না। বনে বনে

বস্ত্র পরিয়া গৃহস্থালী বৌটীর মত, সর্ব্বতোভাবে সুশিক্ষিতা হইল। এবং ঐ রূপে এক বৎসরকাল কাটাইবার পর ; আবার তাহার বনবিহারাভিলাষ বলবৎ হইল।"

ঠাকুর একবার বলিতেছেন, পুরুষের বাতাসে, যোগিনীও গৃহিনী হইয়া যায়।' কপালকুণ্ডলাও যোগিনী হইতে গৃহিনী হইয়া গেল। তবে, আবার তাহার যোগিনী হইবার সাধ জন্মিল কেন ? তবে কি কালীমাতার সন্দেহটা সত্য—কপালকুণ্ডলার প্রাণ তাই কি কাপালিকের জন্য কাঁদিয়া উঠিল ?—ঠাকুর এস্থলে যেন, এক গালে কালি, একগালে চুন, আর কপালে সিন্দুর পরিয়া, আমাদের রকমওয়ারী সং দেখাইয়াছেন, বলিতেছেন ;—"এই দেখ আমি যোগিনী, না না—এই দেখ আমি গৃহিনী, নাগো না—আমি বনবাসিনী !"

কপালকুণ্ডলা একবৎসরকাল গৃহিনীরূপে, নবকুমারের পদসেবা করিলেন ; হাবভাব, চালচলন সমুদায় শিক্ষা পাইলেন, তথাপি তাঁহার ধারণা রহিল যে, 'পুরুষে পুরুষে এবং স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যেরূপ সাক্ষাতের অধিকার আছে, স্ত্রী ও পুরুষে সাক্ষাৎ করিবার তেমনি অধিকার আছে। (এখানকার আসল কথাটা ঠাকুর গোপন করিলেও আমরা বলিতেছি। নবকুমারের বাড়ীতে স্ত্রী পুরুষে সাক্ষাৎ হইত, তাহাই তাহার ধারণা ছিল, স্ত্রীপুরুষে সাক্ষাৎ করিতে দোষ নাই। ঠাকুর সরমের খাতিরে সকল কথা প্রকাশ করিতে না পারিয়া ; খাতা-খানিকে গোঁজামিলন করিয়াছেন। তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, সহস্র মিথ্যা বলিলেও একটা সত্যকে গোপন করা যায় না। দশলক্ষ তারার মধ্যে যেমন চাহিবা মাত্র চাঁদকে সর্ব্বপ্রথম দেখা যায়, তেমনি দশলক্ষ মিথ্যার মধ্যে একটি সত্য কথা থাকিলে, তাহা এক চাহনীতেই ধরা পড়ে। তা' বলিয়া অন্ধরা ধরিতে পারে কি ?)

ঠাকুর বলিতেছেন।—"নবকুমার পিতৃহীন, সংসারে তাহার বিধবা মাতা এবং দুইটি ভগিনী মাত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা বিধবা, তাহার সহিত পাঠক মহাশয়ের পরিচয় হইবে না (কেন হইবে না তাহা বলেন নাই, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।) কনিষ্ঠা শ্যামাসুন্দরী ইনি সধবা হইয়াও বিধবা, কেন না তিনি কুলীনপত্নী। (ঠাকুর বিধবা ভগ্নীর কথা উল্লেখ করিলেনই বা কেন, আবার তাহার কথা চাপিয়া গেলেনই বা

তাহার দুই ভগিনী, একজন প্রকাশ্য বিধবা, এবং অন্যজন অপ্রকাশ্য বিধবা।— নবকুমার অনেক দিন প্রবাসে ছিলেন।'

ঠাকুর, নবকুমারের গৃহখানি এবং গৃহবাসিনীদের অবস্থা যেরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। যেরূপে ঐ বাড়ীর বউ পদ্মাবতীকে মুসলমান করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাতে ঐ আবাসখানি দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে, গণিকাগৃহ বলিয়া প্রতীত হইবে কি না? যদি নবকুমারের কুলের বা বংশের কোনরূপ গৌরব থাকিবে, তবে কপালকুণ্ডলার কুলচী সম্বন্ধে কোন কথা উঠিবে না কেন?—বেশ্যালয়ে একটি নূতন ছুক্‌রী আসিলে যেমন তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বাড়িওয়ালী তাহাকে গ্রহণ করে, এবং কুলচীর দিকে চাহিয়াও দেখে না, কপালকুণ্ডলাকেও সেইরূপে গ্রহণ করিয়াছে কিনা?—সহস্র মিথ্যা বলিয়াও ঠাকুর সত্য কথা গোপন করিতে পারিয়াছেন কি? সাধে কি ঠাকুরকে গুটিপোকা উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

সম্রাটবুদ্ধি ঠাকুর বলিতেছেন।—"পদ্মাবতী মুসলমান হইবার পর, বিবাহ করিলেন না। শতপুষ্পের ভ্রমরী হইয়া কাননে কাননে মধুপান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। খাঁনআজীম প্রভৃতি আগ্রা এবং দিল্লীর ওমরাহগণ পদ্মাবতীর প্রেমিক ও বাধ্য ছিলেন।" আবার বলিতেছেন "কুমার সেলিম তাঁহাকে এতদূর ভাল বাসিতেন যে, তাঁহাকেই পাঠরাণী করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।" (সেলিমের রুচি বোধ করি ঠাকুরের রুচির মত ছিল। তাই তিনি শতপুষ্পের ভ্রমরীকে, পাঠরাণী করিতে স্থির করিয়াছিলেন। না—না, ঠাকুর এখানে পাঠকের মস্তিষ্ক, নালার জলে ধৌত করিয়া, রাঙের অলঙ্কারে সাজাইয়া, দেখাইতেছেন যে, একটা তুচ্ছ বঙ্গনারী পাঠরাণী হইবার বুদ্ধি বহন করে, পাঠকেরাও সেই অলীক অহঙ্কারে উন্মত্ত।) তবে পদ্মাবতী পাঠরাণী হইল না কেন?—আকবর বাদশার মৃত্যুর পর, কুমার সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া, দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিয়া, নূরজাহানকে বিবাহ করিতে চান। নূরজাহান তখন, শেরআফগানের বিবাহিতা পত্নীরূপে, বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পদ্মাবতী সেলিমের পাঠরাণী পদ হইতে হতাশ হইলেন। সেলিম তাঁহাকে পাঠরাণী না করিয়া, দশজন বেগমের মধ্যে একজন করিয়া রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু সে পদ তাঁহার মনে ধরিল না। সেই সময়ে

বর্দ্ধমান গিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া নূরজাহানের ভাবগতিকে বুঝিতে পারিলেন যে. নূরজাহান সেলিমের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছেন। পরন্তু পদ্মাবতীর পাঠরাণী হইবার আশা এককালীন নিবিয়া গেল। তাই, পদ্মাবতী সেলিমের বেগম পদ বা খানাজিম ও ওম্‌রাওদের পত্নীত্ব পদ প্রভৃতি সমুদায়ই অগ্রাহ্য করিয়া, নবকুমারের কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুকা হইলেন। (ধন্য তুমি বঙ্গের সম্রাট! তোমার অভাবেই আমরা স্বরাজ পাইতেছি না।)

ঠাকুর আরও বলিয়াছেন যে, "রামগোবিন্দ সপরিবারে মুসলমান হইবার পর, একবার সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও পাড়ার পাঁচ জন,তাঁহার সহিত চলনবলন বন্ধ করায় তিনি আবার আগ্রায় চলিয়া যান।" ইহাতেই প্রমাণ পায় যে,—পদ্মাবতী বেশ জানিতেন যে, নবকুমার তাঁহাকে কিছুতেই গৃহে প্রবেশ করিতে দিবেন না; তবে কেন তিনি, শাহানশাহের বেগম না হইয়া তাঁহার পর্ণাবাসে প্রবেশ করিতে যাইবেন? (ঠাকুরের বুদ্ধির উপমা পাওয়া ভার!—'এক চাপরাসী, তাহার বুদ্ধিবলে ক্রমশঃ উন্নতি করিয়া, এক রাজার মন্ত্রিত্বপদ পাইয়া যায়। বৃদ্ধ রাজা মরিলে তিনিই রাজপদ পাইবেন, লোকে এমনি বলিত। কিন্তু রাজা মরিবার পর অন্য একজন রাজা হইলেন। তিনি হইলেন না। সেই অভিমানে সেই জ্ঞানী মন্ত্রী, তাঁহার পোষাকাদি ফেলিয়া, সাবেক চাপরাসীর পোষাক পরিতে গেলেন। তখন তাঁর সেই চাপরাসীর পোষাক অন্য চাপরাসীর অধিকারে ছিল। মন্ত্রী সেই চাপরাসীর সহিত ঝগড়া করিতে লাগিলেন, এবং পাকচক্রে তাহাকে রাজদ্রোহী সাব্যস্ত করিয়া চাপরাস কাড়িয়া নিজে পরিবার চেষ্টা করিলেন। নিরীহ চাপরাসীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল, হেড চাপরাসী তাহাকে লইয়া শ্মশানে যাইতে ছিল, পথে দুইজনেই একটা গর্ত্তে পড়িয়া মরিয়া গেল।' ঠাকুর শতবার কল্পনা পরিবর্ত্তন করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া অবশেষে উক্তরূপে মিলাইয়া গ্রন্থখানি শেষ করিয়াছেন।)

দিল্লীর পাঠরাণী হইবার উপযুক্ত জ্ঞান যে রমণীতে আছে, সেরূপ বুদ্ধিমতীর অর্থাভাব, লোকাভাব বা কৌশলাভাব নিশ্চয়ই নাই। পদ্মাবতী যখন সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, এবং সে যখন নবকুমারের জন্য পাগলিনী, সে অবস্থায়, নবকুমারকে মুসলমান করিয়া লওয়া কি তাহার জন্য কঠিন কার্য্য? পদ্মাবতী তাহাই

কুমারের সহিত কিরূপে তাহার প্রথম দিন সাক্ষাৎ হইল, কি কি কথা হইল, ঠাকুর তাহা গোপন করিলেন। দ্বিতীয় দিবসের কথাগুলি যেমন তেমন করিয়া বলিলেন এবং তৃতীয় সাক্ষাতে পদ্মাবতী অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু নবকুমার কিছুতেই তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। শেষে তিনি দাসীরূপে তাঁহার আবাসে থাকিতে চাহিলেন, নবকুমার তাহাতেও স্বীকার করিলেন না। পায়ে পড়িলেন হাতে ধরিলেন, তাঁহাকে ধনের রাজা করিতে চাহিলেন, তাতেও প্রাণ গলিল না। (বাঙ্গালীকে চাকরী দিতে চাহিলেই যে, সকল কাজ পাওয়া যায়, বোধ করি পদ্মাবতী তাহা জানিতেন না।)

পদ্মাবতী এইবার রাগ দেখাইলেন। (বাঙ্গালীরা নরমের বাঘ, গরমের গোলাম, কাজেই নবকুমার এতদিন পর, পদ্মাবতীকে, তাঁহার সেই মুসলমান পত্নী বলিয়া চিনিতে পারিলেন।) বলিলেন। "তুমি কে?" পদ্মাবতী বলিলেন। "আমি পদ্মাবতী।" এই বলিয়াই তিনি কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। নবকুমার সে স্থল পরিত্যাগ করিলেন।—(ঠাকুরের বলিহারী যাই কল্পনা! ঠাকুর যেন, কতকগুলি চূর্ণ পুত্তলিকা লইয়া, একটার হাত, অন্যটার পা, আর একটার মাথা, অপর একটার বক্ষ ইত্যাদি একত্র করিয়া লাক্ষাবলে সংযোজিত করিয়া এক অভিনব পুতুল প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছেন।—ঠাকুরের যতগুলি পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সকলই, ইংরেজি ও পারশী লেখকদিগের হাত পা ভাঙ্গা কল্পনার যোড়া লাগান মাত্র।—পাঠকেরা তাহাতেই আনন্দে দিশাহারা হইয়াছেন।)

৫ * কাবাবরুটী হজম। * ৫

(ঠাকুর, যে সকল কথা হজম করিয়াছিলেন দামোদর বাবু বিরেচক ঔষধ দিয়া তাহা নির্গত করাইয়া পাঠকদিগকে তদীয় মৃন্ময়ীগ্রন্থে দেখাইয়াছেন।—পদ্মাবতী এবং জাহাঙ্গীর এই দুইজনকে কক্ষের পালঙ্কে বসাইয়া নবকুমারকে সেই গৃহের দ্বারে ভেড়ুয়ার ন্যায় দাঁড় করাইয়া ঠাকুরের পাঠকদিগকে চক্ষুদান করিয়াছেন।)

পদ্মাবতী যখন বলিলেন—"আমি পদ্মাবতী" তখন নবকুমার আবার তাঁহার

প্রকার প্রবাহে পড়িয়া বিষম বিপদে পড়িলেন। শেষে সজল নয়নে বলিলেন।—"পদ্মাবতী। কেন দেখা দিয়া, নিবান অনল আবার জ্বালিয়া দিলে?"

পদ্মাবতীও সজলনয়না হইয়া উত্তর করিলেন। "তুমি কেন সেই চটিতে ঘন ঘন আমার দিকে চাহিয়া, আমাকে উচাটন প্রাণ করিয়া তুলিয়াছিলে?"

নবকুমার কাতরস্বরে কহিলেন। "পদ্ম আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না।" পদ্ম। "কেন পারিবে না। না পারিবে তবে, আমাকে বিবাহ করিয়াছিলে কেন? জীবন মরণের সঙ্গিনী করিয়াছিলে কেন? তুমি 'পারিব না' বলিলে, আমি ছাড়িব কেন? তুমি মরিলে যে আমাকে তোমার সহিত সহমৃতা হইতে হইত। আমি তোমার জন্য জীবন ত্যাগ করিতে পারি, তুমি কি আমার জন্য কিছুই ত্যাগ করিতে পার না?"

নবকুমার। "আমি অতি ধর্ম্মভীরু। তোমাকে গ্রহণ করিলে লোকে আমাকে কি বলিবে। তুমি মুসলমান হইয়াছ, তাতেই সমাজে আমাদের নাক কান নাই। কেহই আমাকে কন্যাদান করিল না। সকলে এরূপে ঘৃণা করে, যেন আমিই মুসলমান হইয়াছি। আমরা একপ্রকার সমাজচ্যুত বলিলেই চলে।"

পদ্মাবতী। "এতদূর অন্যায় বিচারেও সমাজকে চিনিলে না! এখনও ঐ পাপ সমাজের মুখ চাহিতেছ? আমি মুসলমান, তাই যেন আমাকে লইবে না। কিন্তু তুমিও কি মুসলমান নও? কপালকুণ্ডলাকে লইলে কেন?" নবকুমার পদ্মাবতীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; পদ্মাবতী বলিতে লাগিলেন। "আমার কথা বিশ্বাস করিবে কি? কপালকুণ্ডলা যে, একজন মুসলমানের জন্মিত শূদ্রীগর্ভজাত কন্যা! তাকে লইতে পারিলে আমাকে লইবে না কেন?"

নবকুমার স্তিমিত নয়নে পদ্মাবতীর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি কি আমাকে মিথ্যা বলিবে।—আমি যখন জানিনা, তখন তোমার কথা বিশ্বাস করিব বৈ কি?—কপালকুণ্ডলাকে লইয়াও আমি সমাজে ঘৃণিত।"

পদ্মা। "যখন সমাজ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন আমাকে গ্রহণ করিতে দোষ কি?" নবকুমার। "তুমি যে জগৎরাষ্ট্র যবনী। তাই তোমাকে লইতে পারিতেছি না। তা, আমি গোপনে মাঝে মাঝে আসিয়া সাক্ষাৎ দিয়া যাইব।"

লজ্জায় অবনতমস্তক হইলেন। পদ্মাবতী তাঁহার মুখখানি দুই হাতে ধরিয়া তুলিলেন। এবং তাঁহার অধর যুগলে স্বীয় অধর যুগল রাখিয়া একটি মিঠেকড়া রকমের চুম্বন করিলেন। নবকুমার তখন মনে মনে রামের নাম করিয়াছিলেন কিনা, বলিতে পারি না। পদ্মাবতী খরচোখে চাহিয়া বলিলেন। "বল, সে কোথায়! নৈলে আমার দ্বিতীয় চুম্বন তোমার শোণিত দর্শন করিবে।"

নবকুমার। "আমি বলিতে পারিনা সে কাহার সঙ্গে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।—আমি তখন তীর্থভূমে, বিদেশে ছিলাম।" এই বলিয়া পদ্মাবতীর সম্মুখে কাঁদিতে লাগিলেন। পদ্মাবতী তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া সান্ত্বনার বাক্যে বলিলেন। "আমি যদি তোমার এই মহাকলঙ্ক মোচন করিয়া দেই, তুমি করাইবে কি?—বল না, করাইবে কি না?"

নবকুমার। "কিরূপে আমার কলঙ্ক তুলিতে পারিবে?" পদ্মা। "সে আমি যেরূপে পারি তুলিব।—তুমি তোলাইবে কি না?" নব। "তোলাইব।" অমনি পদ্মাবতী পেশমানকে ডাকিলেন। পেশমান কক্ষান্তরে শয়ন করিয়াছিল, যেমন উঠিল অমনি তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশু কাঁদিয়া উঠিল। সে বলিল,—"ছেলে যে কাঁদিতেছে, বিবি!" পদ্মা। "ওকে আমার কোলে দিবি, আন!—আমার তো আর ছেলে হবার আশা নাই।—আন তোদের ছেলেই পালন করিয়া মন ভুলাই।"

পেশমান, আধহাত ঘোমটা দিয়া, ছেলে আনিয়া পদ্মাবতীর কোলে দিল। পদ্মাবতী হাসিয়া হাসিয়া পেশমানকে বলিলেন। "ওরে শুনেছিস, শ্রীকৃষ্ণ রাধার কলঙ্কভঞ্জন করেছিল, আজ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্কভঞ্জন করিবে?—ভাবিস কি, যা কলঙ্কের ডালি সাজাইয়া আন্।—আজ কলঙ্কের হাড় পর্য্যন্ত চিবাইয়া খাইব।" পেশমান চলিয়া গেল, নবকুমার কোন কথা বুঝিতে না পারিয়া, কেবল দুই জনের মুখ পানে ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

পদ্মাবতী পেশমানের খোকাকে খেলা দিয়া বলিতে লাগিলেন। "বাবার কোলে যাবি কি, মামার কোলে যাবি?—মামার কোলে?—কই তোর মামা?—ঐ যে?"—এই বলিয়া শিশুটিকে নবকুমারের কোলে তুলিয়া দিলেন।

সে দিকে পেশমান, দুইখানা থাল দুইহাতে লইয়া এবং দস্তরখান বা অন্নাসন খানি, কাঁধে ফেলিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং নবকুমার ও পদ্মাবতীর মধ্যভাগে দস্তরখান বিছাইয়া তাহার উপর স্বুবর্ণ থালাদ্বয় রাখিল। একটি থালায়

কাবাবসহ ভাজা মাংস, অন্যটিতে ঘিয়ে ছাঁকা পারাঠা। নবকুমার গতিক বুঝিয়া 'রাম বল' বলিয়া সরিয়া বসিলেন। পদ্মাবতী হাসিয়া বলিলেন। "রামের নহে, শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্কভঞ্জন হইবে, সরিয়া আইস!" এবং পেশমানের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন। "তুইও বস।"

পেশমান কিছুতেই বসিল না। সে নবকুমারকেও ছাপাইয়া হিন্দুয়ানী দেখাইতে লাগিল। "আমি বাঁদী, আমি কেন বসিব?—আপনারা মিঞাবিবি আহার করুন, আমি আজ্ঞা পালনে উপস্থিত থাকি।" এই বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

পদ্মাবতী রাগিয়া বলিলেন। "বস নৈলে তোর ছেলের গলা টিপিয়া ধরিব।" পেশমান কলা বউটি হইয়া বসিল। নবকুমার ভাবিলেন।—'পেশমান আমার সম্মুখে ঘোমটা খোলে না কেন?'—যাহা হউক নবকুমার কিছুতেই সেই জাতি-বিনাশক অখাদ্য খাইতে প্রস্তুত হইলেন না।—পদ্মাবতী অনেক যত্ন করিয়াও খাওয়াইতে পারিলেন না।—শেষে পেশমানকে ইশারা করিয়া বলিলেন,—"যা তোর স্বামীকে ডেকে আন।"

নবকুমার যেন ক্রমশই হতবুদ্ধি ও উদভ্রান্তচিত্ত হইতে লাগিলেন। শেষে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন। "একি পদ্মা! কেন তুমি আমার জাত নষ্ট করিবে?"

পদ্মা। "তোমার মোটা বুদ্ধিতে কি এখনও কুলাইতেছে না যে, তোমার জাত খানি ফুটি ফাটা হইয়া গিয়াছে।—চলন সইও নাই!—আমি তোমার ভাঙ্গা জাতটা আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া, তোমাকে নূতন জাত কিনিয়া দিব।—সে জাত টন টন করিয়া বাজিবে। তাতে, দালভাত ও চচ্চড়ি হইতে, পোলাও কাবাব কোর্ম্মা প্রভৃতি সকল জিনিষই পাক করা হইবে!"

এমন সময়ে মাথায় টুপি পরিয়া পেশমানের স্বামী সেখ সোলেমান আসিল। এবং নবকুবারকে সম্বোধন করিয়া বলিল।—"সালাম-আলেক ভাই! আজ যে গরিব খানায় পুর্ণচাঁদের উদয়—তা' ভা'জ ভাল আছেন তো!'

নবকুমার হা করিয়া সোলেমানের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার সেই সম্বোধনের কোনই অর্থ বুঝিতে পারিলেন না।—সোলেমান লজ্জিত হইয়া পেশমানের গালে এক চড় মারিল। "তোর হিন্দুবুদ্ধিটা মরিলেও যাইবে না।—তুই বুঝি ভাইকে পরিচয় দিস নাই।"

সোলেমান বলিল। "ভাই আমিই পরিচয় দিতেছি।"—এই বলিয়া পেশমানের হাত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইল, তাহার ঘোম্‌টা খুলিয়া দিল। পেশমান নূতন কনের মত চোখ বন্ধ করিয়া লইল। সোলেমান বলিল।—"এঁকে আপনি চেনেন কি?—দেখুন, ইনি আপনার ভগ্নী গৌরীমণি।—আমি এঁকে ধর্ম্ম প্রথামতে বিবাহ করিয়াছি। শিশুটি আপনারই ভাগিনেয়।—তা দয়া করিয়া যদি ভাগিনেয়ের বাড়ীতে আসিয়াছেন; যৎসামান্য পানাহার করিয়া যান।" (পাঠক, বুঝিয়া যাইবেন—ঠাকুর এখানে কেমন গরম গরম কাবাব পারাঠা হজম করিয়াছিলেন। পরক্ষণেই দেখিবেন, ঠাকুর সির্কা ও আদার রস প্রভৃতি হজমিগুলি খাইতেছেন।

নবকুমার চাহিতেই পেশমানকে চিনিতে পারিলেন। স্তিমিত নয়নে গৌরীমণির মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়াকাশ অফুরন্ত চিন্তামালায় পরিছন্ন হইয়া গেল।—চিন্তা, দুর্ভাবনা, লজ্জা উদ্বিগ্নতা ও অপমানাদি তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইয়া, প্রবলরূপে দ্বন্দ্ব করিতে লাগিল। একবার ভাবিলেন, আত্মঘাতী হইয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিবেন। আবার ভাবিলেন; তিনি মরিলে কপালকুণ্ডলা এবং শ্যামাসুন্দরীও এই পথ-গামিনী হইবে।—একবার ভাবিলেন, 'আমি যদি মস্ত বীর হইতাম; নগরের সকল ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়া, সমাজের মাথায় লাথি মারিয়া, জাতির মাথায় প্রস্রাব করিয়া, পদ্মাবতীর সঙ্গে আগ্রা চলিয়া যাইতাম। আর দেখিতাম এই সকল পাপীকে মুসলমান করিতে পারিতাম কি না!—এদিকে সোলেমান অনবরত 'খাও ভাই খাও ভাই' করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে গৌরীও 'মাথাখাও মাথাখাও' করিতে ভোলে নাই।—নবকুমার যেন চিন্তায় আত্মবিস্মৃত হইয়া, একটু খাইলেন। আস্বাদ পাইয়া আবার খাইলেন এবং খাইতে খাইতে দুইজনে সমস্তটা খাইয়া ফেলিলেন। তখন পদ্মাবতী পেশমানকে আরও আনিতে বলিলেন। কিন্তু নবকুমার আর খাইতে চাহিলেন না। আহারান্তে সোলেমান ও গৌরী চলিয়া গেল। পদ্মাবতী নবকুমারের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। নবকুমার বলিলেন। "ফাটা হাঁড়ী তো আঁস্তাকুড়েই পড়িল।—এইবার বল কপালকুণ্ডলা কে?" পদ্মা। "যদি মুসলমান হও তবে বলিব।—নচেৎ বলিব না।"

নবকুমার ভাবিয়াছিলেন 'কাবাব খাইয়াই তিনি মুসলমান হইয়া গিয়াছেন।'

আমাকে লইয়া তোমাদের এখানে আসিয়াছিলেন।—তখন যে আমাকে গ্রহণ করিতে দাও নাই। তখন আমাদের কিরূপে ঘৃণা করিয়া তাড়াইলে, আমাদের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিলে না; তাহা মনে নাই কি? আমিও স্বভাবতঃ কেমন রাগীমেয়ে তাও তো তুমি জান! আমি সেই হইতে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, তোমাদের সকলকে মুসলমান করিয়া ছাড়িব। আর সমাজের বড়বড় নাকওয়ালা পণ্ডিত, যেমন —হরকৃষ্ণ, পুলিন, অধর, ভৈরব ও ভবেশ, এদেরকেও একহাত দেখাইব।"

নব। "তাদের কুলেও সাত বোতল কালী পড়িয়াছে। তাদের পাঁচ বাড়ীর সাতটা মেয়ে, একে তাকে নিয়ে পালিয়েছে। তাদের মধ্যে ছয়টা নবীনা বিধবা আর একটা নাকি ১৫ বৎসরের কুমারী ছিল।" পদ্মাবতী। "তুমি সে কুমারীকে চিনিতে কি?" নব। "না! তার নাম ছিল রঘুরাণী। শুনেছি সে মেয়েটি সপ্তগ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠা-সুন্দরী। কে একজন সন্ন্যাসী তাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। বাকী ছয় জন ভ্রষ্টা হইয়া পলায়ন করিয়াছে।" পদ্মাবতী। "তুমি কি রঘুরাণীকে কখনও দেখ নাই? তার রূপের কথা কোথায় শুনিলে?" নব। "তুমি মুসলমান হইয়া গেলে তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হয়, সেইসূত্রে ঘটকীর মুখে শুনিয়াছিলাম।"

পদ্মা। "বিবাহ করিলে না কেন?" নবকুমার। "তুমি কুলের বাহির হইয়াছ, তাই তারা কন্যাদান দূরে থাক, ঘৃণাসহ দশকথা শুনাইয়া দিল। আমি সেই লজ্জায় কতক দিনের জন্য তীর্থে গমন করিলাম।"

পদ্মাবতী ফিরিয়া বসিয়া বলিলেন। "সাধে বলি! তোমরা শ্মশানজাত শবের মত অন্ধকারে পড়িয়া আছ। শৃগাল কুকুর, তোমাদিগকে অপমান সূচক ছোবলে ছোবলাইয়া খাইতেছে, তোমাদের তায় সাড়াও নাই, অপমানও নাই। আলো দেখাইলেও পথ দেখিতে পাওনা। তোমরা এমন মায়ামন্ত্রে তন্দ্রীভূত যে, শ্মশানে পড়িয়া ভূতপেত্নীসহ পৈশাচিক কার্য্যে পরিলিপ্ত থাকিবে, তথাপি জাগিবে না। তোমাদের মত উদ্‌ভ্রান্ত জাতি, জগন্মধ্যে আর আছে কিনা সন্দেহ।" নবকুমার। "সে কথা থাক!—আমাকে বল, কপালকুণ্ডলা কাহার কন্যা!" পদ্মাবতী হাসিয়া বলিলেন। "তুমিই রঘুনাথ, বাকি কথা পরে বলিব।" এই বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া কক্ষান্তরে প্রবিষ্টা হইলেন।

ঔ ✻ হজ্জমীগুলি। ✻ ঔ

করিতে না পারিয়া পুস্তক ভরিয়া উহার ঢেকার তুলিয়াছেন। এইবার দেখিবেন তিনি কিরূপে আদার রস, সির্কা, সিকেন জেমিন আদি সোডা ওয়াটার ও হজমীগুলি সেবন করিতেছেন। পেটরোগা রোগীর মত ঠাকুরের রুচি কেবল গুরুপাক দ্রব্যে।)

(ঠাকুর পদ্মাবতীকে সপ্তগ্রামে আনিয়া, এক মহা বিপদে পড়িয়াছেন। 'এখন নবকুমার কপালকুণ্ডলার হইবে কি পদ্মাবতীর হইবে?' ঠাকুর এই কথার মীমাংসায় পড়িয়াছেন। যদি পদ্মাবতীর পক্ষাবলম্বন করেন, তবে কুল-বিনাশক কাবাবরুটি ধরা পড়ে। আর যদি কপালকুণ্ডলার সাপেক্ষ হন, তবে পদ্মাবতী ঠাকুরের গলা টিপিয়া বলিবে,—'তুমি তবে আমাকে, এখানে আনিলে কেন?' ঠাকুর এইবার দ্বিতরীচরণ হইয়াছেন। দামোদর বাবু তাঁহার মৃন্ময়ী গ্রন্থের ১৬ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন,—'সংসার ধর্ম্ম যায় যাউক, লোক সমাজে অপমান হই হইব, অদৃষ্টে যাহা থাকে হউক, অদ্য প্রকাশ্যে বলিতেছি পদ্মাবতী তুমি আমার পত্নী, তোমাকে আর কষ্ট দিব না।')

ফাঁপা পেটে এক ছটাক আদার রস ঢালিয়া, ঠাকুর চিন্তা করিলেন। 'হিজলী হইতে কাপালিককে আনিবেন, সে আসিয়া গোপনে বনে বসিয়া থাকিবে, এবং কপালকুণ্ডলাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে।' আবার ভাবিলেন,—'কপালকুণ্ডলা বনে যাইবে কেন?" ঠাকুরের আদার রস কাজে আসিল না। তিনি এবার সির্কা খাইয়া ভাবিলেন,—"শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে আনিতে হইবে। শ্যামা তাহাকে বশ করিবার জন্য, নিশার গভীরে, কপালকুণ্ডলাকে সঙ্গে লইয়া, বনের মধ্যে ঔষধ তুলিতে যাইবে; অমনি কাপালিক তাহাকে ধরিয়া হিজলী লইয়া যাইবে।" আবার ভাবিলেন। "শ্যামা সঙ্গে থাকিতে, কপালকুণ্ডলাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে—এ কথা থাপ্‌সই হইবে কেন?" ঠাকুর একটু পাতিলেবুর রস পান করিলেন। ভাবিলেন —"শ্যামা দুইরাত্র ঔষধ খুঁজিয়া পাইল না। রাত্রে বনে যাইত বলিয়া শ্যামার স্বামী; তাহার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিল। সেই জন্য তৃতীয় দিবসে, শ্যামা না যাইয়া, কপালকুণ্ডলাকে পাঠাইবে, অমনি কাপালিক তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে।" ঠাকুর আবার ভাবিলেন,—'না, ইহাও হইল না। কপালকুণ্ডলাকে লইয়া গেলে, নবকুমার শেষে যবনী পদ্মাবতীর হাতে পড়িয়া যাইবে। তাহলেই যে, ব্রাহ্মণের

লাগিলেন। হুকুম করিলেন,—"আন 'সোডা-ওয়াটার' দেখি, এ কাবাবরুটি হজম করিতে পারি কি না ?" (এখানে কাবাব রুটির অর্থ সত্য কাবাবরুটি নহে, নবকুমারের মুসলমান হওয়া কথাটাকে কবাবরুটি বলা হইতেছে।)

ঠাকুর সোডাওয়াটার পান করিলেন। গোটাকতক কাবাবরুটির ঢেকার উঠিল, পেটের ফাঁপটা কিছু কমিল। তখন আবার চিন্তা করিতে বসিলেন। "নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলা, উভয়জনকেই প্রাণ বিনাশ না করিতে পারিলে, যবনীর হাত হইতে এড়াইবার উপায়ান্তর নাই। কাপালিক দুই জনকেই মা কালীর নিকট বলিদান করিলেই ঠিক হইবে। কপালকুণ্ডলার পশ্চাতে পশ্চাতে নবকুমার যাইবে। কাপালিক অমনি দুইজনকে ধরিবে।' না, তাও হবেনা। উহারা প্রাণ দিতে স্বীকার করিবে কেন ? 'হাঁ করিবে ! আকাশে মেঘ উঠিবে, মেঘের ভিতর দেবী থাকিবে। দেবীর উপদেশে কপালকুণ্ডলা প্রাণদিতে স্বীকৃতা হইবে।' কিন্তু নবকুমার তাকে ছাড়িবে কেন ?—ভাল পাপ খাইয়াছিলাম, এ পাপ যে, কিছুতেই হজম হয় না। ঠাকুর আপন গাল আপনি চড়াইতে লাগিলেন ; পেটেও দ্বাদশ কীল মারিলেন। এবং রাগে, একেবারে এগার গণ্ডা হজমী গুলি খাইলেন। তাহাতে কতিপয় দাস্ত হইল, ঠাকুর সুস্থির হইয়া বসিলেন। কল্পনার স্রোত ফিরাইলেন। এবার তিনি, পদ্মাবতীকে পুরুষ সাজাইয়া, কপালকুণ্ডলার সহিত দেখা করাইবেন। এবং কাপালিক নবকুমারকে বলিয়া দিবে যে, তাহার স্ত্রী অবিশ্বাসিনী, এবং পুরুষবেশা পদ্মাবতীকে তাহার উপপতি বলিয়া দেখাইয়া দিবেন। এই ঠিক হইবে, পতঙ্গবুদ্ধি বাঙ্গালীকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে যথেষ্ট হইবে। ঠাকুর আনন্দে কতক্ষণ নাচিবার পর আবার লিখিতে বসিলেন।"

"শ্যামাসুন্দরীর অনুরোধে, কপালকুণ্ডলা গভীর রাত্রে, ঔষধ তুলিতে বনমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব হইতে সেই বনে কাপালিক [illegible] ছিল, পদ্মাবতী পুরুষবেশে সেই বনে আসিয়া, কাপালিককে তাহার গৃহে [illegible] এবং দুইজনে মিলিয়া কপালকুণ্ডলাকে বিনাশ করিবার ষড়যন্ত্র করি[illegible] লাগিল। কপালকুণ্ডলা ঔষধের জন্য বনে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার মনে [illegible] কথা উদয় হইল, সে আনমনে যাইতে যাইতে বন ছাড়াইয়া পদ্মাবতীর [illegible] উঠিল এবং তাহাদের গুপ্ত কথাগুলি কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। [illegible]

একজন দেখিয়া বলে 'ওরে বুড়ী তুই লবণ বাঁধিস কেন ?" বৃদ্ধা বলে। "ঐ দেখ, পোড়া মন আর কি, আগুন লইতে আসিয়া লবণ বাঁধিতেছি। মাগো, এইজন্য বাড়ীতে বউ ঝিয়েরা বকিয়া মরে।' ঠাকুরও সেই কল্পনা করিয়াছেন।) পদ্মাবতী জানিতে পারিল যে, কে তাহার জানালার পার্শ্বে লুকাইয়া আছে। অমনি সে সেই পুরুষবেশে আসিয়া কপালকুণ্ডলার হাত ধরিল।

কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া পদ্মাবতীর মনে দয়ার উদয় হইল। তাহার সর্ব্বনাশ করিতে আর তাহার ইচ্ছা হইল না। তবে কাপালিকের কথা রাখিয়া বলিল। "কপালকুণ্ডলা! তুমি কাল রাত্রে একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও, আমি তোমাকে কতকগুলি কথা বলিব।" কপালকুণ্ডলা দেখা করিতে প্রতিশ্রুতা হইল। (ঠাকুরের ঔষধ তোলা কথাটা তাঁহার মাথাতেই চরিয়া গেল।) পরদিবস কাপালিক নবকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "কপালকুণ্ডলা নিয়ত রাত্রে, অভিসারে গমন করে। আজ তুমি আমার সঙ্গে থাকিও আমি তোমাকে দেখাইয়া দিব। তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিও, আমি তাহাকে কালী মায়ের পদে বলি দিব। নবকুমার তাহাতে স্বীকার পাইল। (ঠাকুর আমাদিগকে মালিনীর মেড়া মনে করেন নাকি ?)

রাত্রিকালে কপালকুণ্ডলা, পুরুষবেশা পদ্মাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল, পথে যাইতে যাইতে, আকাশে মেঘের পাশে দেবী দেখিয়াছিল। দেবীর আদেশে সে, বলি যাইতে স্বীকৃতা হইল। যখন সে পদ্মাবতীর নিকট বসিয়া কথা কহিতে থাকে, সেই সময়ে কাপালিক, কতকগুলি বটিকা নবকুমারকে খাওয়াইয়া, তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত করিয়া লয়; এবং কপালকুণ্ডলাকে দেখাইয়া দেয়। নবকুমার তখনি কপালকুণ্ডলাকে ডাকে, সে অমনি পদ্মাবতীর নিকট হইতে স্বামীর নিকট চলিয়া আসে। ঠাকুরের স্বাভাবুদ্ধির মর্য্যাদা রাখিয়া নবকুমার, কপালকুণ্ডলার উপপতিকে ধরিবার চেষ্টা করিল না। পরন্তু কাপালিক তাদের দুইজনকে সঙ্গে করিয়া তাহার গন্তব্যপথে চলিল; এবং এক নদীতীরবর্ত্তী, শ্মশানে লইয়া গিয়া, তথায় হোমাগ্নি জ্বালিল। নবকুমারকে অনুমতি করিল। "তুমি কপালকুণ্ডলাকে নদী হইতে স্নান করাইয়া আন।" (ঠাকুরের কথা ও কল্পনার কাট ছাট কি সুন্দর!)

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া নদীতীরে চলিল। পথে কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা

দিতাম।" (অমনি আবার ঠাকুরের পেট ফাঁপিতে লাগিল, আবার বদহজমা দেখা দিল। ঠাকুর সেই শ্মশানেই চিৎপাত হইয়া পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে বায়ুবহুল তরলদাস্ত হইতে লাগিল। তিনি তখন ভাবিতে লাগিলেন। "এমন পয়জারও চুরি করিয়া খাইয়াছিলাম; এ পয়জার পেটে পড়িয়া জমাল গোটা, হইয়া গেল। যাই হ'ক, এখন এতদূর আনিয়া ফেলিয়াছি। বই খানাকে তো মেছোহাট করিয়া তুলিয়াছি। এখন উপায় কি করি?" এইরূপ চিন্তা করিয়া আবার কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। "নবকুমার নিতান্ত অসময়ে জানিতে পারিলেন যে, কপালকুণ্ডলা অবিশ্বাসিনী নহে।" অসময়ে—কেন না বাড়ী প্রায় আধপোয়া পথ, ততটা পথ পর্য্যটন করিয়া প্রাণরক্ষা করা তো কঠিন কথা! আবার তায় কাপালিক সঙ্গে নাই যে ধরা পড়িবার ভয় আছে।—এটা যদি নভেল তবে গেঁজেড়ী গল্প কা'কে বলে?) কাজেই পলাইতে না পারিয়া দুইজনে নদীর চরের উপর দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। হঠাৎ চর খসিয়া জলে পড়িয়া গেল। তাহারাও সেই সঙ্গে জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরিল।" (ঠাকুরের বুদ্ধিনদীর বহর দেড় ইঞ্চির অধিক না হইলেও জ্ঞানগম্ভীর পাঠকেরা সেই সলিলশূন্য নদীতে আকাশ দর্শন করিয়া তাহাকে অনন্ত গভীর মনে করিয়া লইয়াছেন; এবং সেই নদীতে রণপোত চালিত করিয়া দেশোদ্ধার করিতে দাঁড়াইয়াছেন।)

ঠাকুর এইরূপে কাঁদিয়া কোঁকাইয়া, সহস্র খণ্ড কল্পনার জোড়া লাগাইয়া, গ্রন্থ খানি শেষ করিয়া, একবার চিন্তা করিলেন। 'পাঠকেরা তো মনে করিতে পারে, যদি নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলা নদীর চর খসিয়া ডুবিয়া মরিবে তবে, লেখক এত বন বেড়াইলেন কেন?—আরে থাম! পতঙ্গবুদ্ধির দৌড় প্রদীপ পর্য্যন্ত!'

পাঠক, মনে রাখিবেন যে আমরা ঠাকুরের প্রত্যেক একশত দোষের মধ্যে একটা করিয়া দেখাইয়া দিতেছি; কাপালিক সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলি নাই। তাতেই নভেল ঠাকুর, কিরূপে ধরা পড়িয়াছেন, তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। এই কমেডি নভেলটিকে, মিলাইতে না পারিয়া ট্রাজেডি করিয়াছেন। মিলনজনক এবং বিচ্ছেদজনক নভেলের মধ্যে কোন আন্তিক প্রভেদ আছে কিনা, বোধ হয় ঠাকুর তাহা জানিতেন না। নভেল কাহাকে বলে তাহাও তিনি বুঝিতেন কি?

প্রচুর পরিমাণে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া থাকে। মন্দবুদ্ধি লোকেরাই মন্দবুদ্ধি লোকের শিক্ষক। বঙ্গবাসী কখনই রাজ্যশাসন করে নাই, কাজেই তাহাদের মাথায় রাজ—বুদ্ধির কোষও নাই। তাহারা প্রকৃতির সহস্রাধিক প্রপীড়নে পড়িয়া এতদুর পতিত ও বুদ্ধিহত হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, দূরবীক্ষণ বুদ্ধির স্থান আর তাহাদের মাথায় নাই। কাজেই নভেল ঠাকুরের হিজিবিজি ময় ভুকল্পনা সকল তাহাদের মন্দ কল্পনায় শান দিবার জন্য যথেষ্ট হইয়াছে। পাঠশালার ছাত্রবর্গ যেমন, তাহাদের গুরুমহাশয়কেই জগন্মধ্যে প্রধান জ্ঞানী ও বিদ্যাপতি বলিয়া ধারণায় আঁকিয়া রাখে, বঙ্গবাসীর জন্য বঙ্কিম বাবুও সেইরূপ। তাই বঙ্গদেশ ভুকল্পীদিগের কেন্দ্র স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিশাল দেশের ঘাসভরা মাথা সকলের উপর চাষ দিতে ও ভাল বীজ বপন করিতে যে, কত সুশিক্ষিত কৃষকের প্রয়োজন হইবে, দেশহিতৈষী সংবাদপত্র সকল কি সে কথার আলোচনা করিবেন না? যদি না করেন তবে তাঁহারা দেশহিতৈষী, আত্মহিতৈষী অথবা হুজুগের পাণ্ডা, সকলেই যেন সে বিচার করিয়া দেখেন।

আমাদের কল্পনা সত্য কি না, তাহা নীচের গুলি পড়িয়া বিচার করুন।

নবকুমার পদ্মাবতীর সহিত নিয়ত সাক্ষাৎ করিতেন এবং তাহাকে আপন সহধর্ম্মিনী স্ত্রী বিবেচনা করিয়া গোপনে গোপনে, মানব নয়ন লুকাইয়া, সমাজের চক্ষু এড়াইয়া ভাল বাসিতেন। তিনি ইদানীং সভ্য বাবুদের মত, নিজের ধারণা ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। অর্থাৎ গোপনে মুসলমান বাড়ী যাতায়াত করিলে, বা তথায় কাবাব পারাঠা আদি খাইলে, বা উইলসনের হোটেলে যাইয়া ইংরাজান্নে পরিপুষ্ট হইলে, ধর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে না। ধীরে ধীরে নবকুমারের ধারণাও সেইরূপে দাঁড়াইয়া গেল। তিনি এই প্রণয়ে,—তাঁহার কুলে কোনরূপ দাগ পড়ে নাই ভাবিয়া, এসলামধর্ম্ম অবলম্বন করিতে আর যত্নবান হইলেন না। কিন্তু পদ্মাবতী তাঁহাকে এসলামধর্ম্মে আনিবার জন্য, ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একদিন নবকুমার পদ্মাবতীকে লইয়া পালঙ্কের উপর বসিয়া আছেন। নবকুমারের মুখখানি বিরস ও মলিনপ্রায় দেখিয়া, পদ্মাবতী তাঁহাকে চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "প্রাণেশ্বর! আজ তোমার বদন চন্দ্রমা এমন বিষণ্ণ কেন?"

নবকুমার পদ্মাবতীকে সকল কথাই প্রাণ খুলিয়া বলিতেন, ভালমন্দ কোন কথারই গোপন করিতেন না, বলিলেন; "মুসলমান না হইলে আমার উপায়ান্তর

মনোমধ্যে এমন কি কথার মীমাংসা করিলে যে, এখন আপনা হইতেই মুসলমান হইবার প্রস্তাব করিতেছ ?"

নবকুমার। "আমার ভগ্নিপতি ব্রজবাবু আসিয়াছে।" পদ্মাবতী। "সে তো শুনিয়াছি, কয়েক দিন হইল আসিয়াছে। এখনও কি বাড়ী যায় নাই ?" নবকুমার। "বোধ করি আর বাড়ী যাইবেও না, এই খানেই থাকিবে।" পদ্মাবতী। "শ্যামা যে স্বামী বশের ঔষধ করিয়াছিল, তাহাতেই বুঝি বশীভূত হইয়াছে ? আহা, আমি যদি সেরূপ ঔষধ জানিতাম, তা'হলে তোমাকে বশ করিতে এত বেগ পাইতে হইত না।—তা বেশ, সুখেরই কথা।"

নবকুমার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া মাথা নাড়িলেন। "উঁহুঁ —তা নয়! ব্রজ: আসিয়া অবধি আমার সহিত কথা কয় না, সাক্ষাৎও করে না। পূর্ব্বদিকের কামরা, এবং আধখানা আন্দাজ আংনা ঘেরিয়া লইয়া, আমাকে এক প্রকার একঘরে করিয়া রাখিয়াছে। তাই ভাবি, সে কুলীনব্রাহ্মণ, আমার সহিত চলিবে কেন ? যখন ভগিনীপতিরও ত্যজ্য হইলাম, তখন কি করি, মুসলমান না হইয়া আর আমার উপায় কি ? মাকেও দেখি ব্রজের পক্ষপাত। কপালকুণ্ডলাকে কেহই আর দেখিতে পারে না। আমার প্রাণ বড়ই উচাটন হইয়াছে। আমি তোমার সহিত কোন দেশে চলিয়া যাইব।"

পদ্মা। "তুমি যদি আমার সহিত পলায়ন কর, তাহা হইলে, তোমার মাতা এবং ভগিনীদের মুখে কালী পড়িবে না ?" নব। "কি করিব! আর আমার উপায় কি ?" পদ্মা। "উপায় আছে, যখন যাইবে তখন সেই উপায় করিয়া দিব।" নব। "আমি তোমারই হইব, তবে কিনা, কপালকুণ্ডলাকে ত্যাগ করিতে পরিব না। —তাতে তুমি কি বল ?"

পদ্মা। "তবে শোন, হরকৃষ্ণের গৌরব নষ্ট করিবার জন্যই আমি রঘুরাণীর সহিত তোমার বিবাহ দিয়াছি। রঘুরাণীও আমার চিরবাধ্য; তাহাই আমি তাহাকে সেই চটিতে গহনা পরাইয়াছিলাম। আমি তাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভালবাসি। সে আমার সখের সতীন। তুমি যদি তাকে ত্যাগ করিতে চাহিতে, আমি তোমার সহিত নিশ্চয়ই দ্বন্দ্ব করিতাম।" নবকুমার সানন্দে পদ্মাবতীকে চুম্বন করিয়া

কপালকুণ্ডলার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছ; তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলনা কেন?" পদ্মা। "সে কথা পরে বলিব। এখন আমার মনে অন্য চিন্তার উদয় হইয়াছে। তোমার ভগ্নী, ভগ্নীপতি, তোমাকে প্রাণে বধ করিবার জন্য কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছে না তো? আজ গভীর রাত্রে তাহাদের জানালার পার্শ্বে গোপনে দাঁড়াইয়া শুনিও দেখি, তাহারা কিরূপ কথায় লিপ্ত থাকে!"

কথাটা নবকুমারের বিশ্বাস হইল। তিনি বাড়ী যাইয়া সেইরূপ করিলেন, এবং যাহা যাহা শুনিলেন, তাহাতে অধিকতর ভীত হইয়া; পরদিবস পদ্মাবতীকে বলিতে আসিলেন। পদ্মাবতী তাঁহাকে সযত্নে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "কিছু বুঝিতে পারিলে কি?" নবকুমার বলিলেন। "হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছি।—আমাদের যাইবার বন্দোবস্ত কর। আমি আর এখানে থাকিব না। আমার বাড়ী এখন বেশ্যালয় অপেক্ষাও অধম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" পদ্মাবতী উচ্চহাস্য দমন করিয়া বলিলেন। "সে কিরূপ?" নব। "আমি জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম। পালঙ্কের উপর ব্রজ, এবং তাহার পাশে শ্যামা বসিয়া আছে। শ্যামা ব্রজের হাত ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতেছে। "আমি তোমার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছি; তুমি আমাকে চরণচ্যুত করিও না।" ব্রজ বলিল। "খোদা মাথার উপর, আমি তোমার প্রেমানলে পুড়িয়া 'কাবাব' হইয়া আছি—" শ্যামা অমনি তাহার মুখের দিকে খরচোখে চাহিল। সে অমনি মুখে হাত দিয়া 'তোবা' করিয়া বলিল। "কালীর দিব্বি, আমি তোমাকে জানের জান করিয়া রাখিব।" শ্যামা বলিল। "আমাকে লইয়া গিয়া কোথায় রাখিবে?" সে বলিল। "তার চিন্তা নাই, খালার বাড়ী রাখিব।" শ্যামা আবার নয়নকোনে রাগ দেখাইল, তখন সে বলিল। "তোবা, মাসীর বাড়ী।—সেখানে তুমি কোরাণ পড়িবে, নমাজ শিখিবে।" শ্যামা। "আবার ওকি বল।" সে বলিল। "কথা মনে থাকে না, একবার আমার কান মলিয়া দাও।" শ্যামা তাহার অধর দংশন করিয়া বলিল। "বল আর বলিবে না।" সে বলিল। "নউজবিল্লা, আবার বলি।" শ্যামা তাহার গালে ঠোক্না দিল, তখন সে বলিল। "রামো আবার বলি।" শ্যামা বলিল। "আমার সহিত প্রবঞ্চনা কর নাই তো?" সে বলিল। "হোসেনী!— তোবা, ব্রজ কখন কাহার সহিত প্রবঞ্চনা করে না।" শ্যামা এবার তার গাল

এইরূপ বলিয়া নবকুমার পদ্মাবতীর নিকট বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। (পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন কি ? নভেল ঠাকুর এই সকল কথা হজম করিতে গিয়া, শেষে তাঁহাকে জামালগোটা খাইতে হইয়াছিল।)

পদ্মাবতী নবকুমারকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন। "তুমি মূর্খ তাই কাঁদিতেছ। যাহার পবিত্রগৃহে বিধবা থাকে, তাহাকে ঐ সকল অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। যাঁহারা জ্ঞানী লোক, তাঁহারা ঐ সকল কথা দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শোনেন না। বরং সমাজের মুখে চাপড়া দিবার জন্য, তাঁহারা সেই বিধবার উপপতির প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। তুমিও হোসেনীর উপর রাগ না করিয়া, দয়া করিতে থাক। মনে করিয়া দেখ, শ্যামা যদি হোসেনীকে লইয়া পলায়ন করে; তখন তোমার মুখে কিরূপে চুনকালি পড়িবে।—যাহাতে উহারা ঐ বাড়ীতেই থাকে, তুমি সে চেষ্টা কর, তাতে তোমার সকল দিক বজায় থাকিবে।"

নবকুমার চিন্তা করিয়া বলিলেন। "যখন এইকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন পাঁচজন জ্ঞানীলোক যাহা করেন, আমাকেও তাহাই করিতে হইবে।—যাহা করিলে, আমার এই লজ্জাবহ কলঙ্ক গভীর গোপনে লুকান যাইতে পারে, আমাকে সেই উপদেশ দাও, আমি তাহাই করিব।"

৮ ❋ পদ্মাবতীর পরামর্শ। ❋ ৮

পদ্মাবতী তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন। "তুমি শ্যামাকে গোপনে ডাকিয়া, বুঝাইয়া বল যে,—"ভগিনি! আমি তোমার সমুদায় গুপ্ত কথা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু আমি তোমার সুখের কণ্টক হইতে চাহিনা। আমি তোমার কলঙ্ক গভীর গোপনে লুকাইয়া রাখিব; তুমিও আমার কলঙ্ক লুকাইয়া রাখিও। প্রণয়ের প্রবল প্রবাহে পড়িলে যখন, সবল পরুষজাতিও অস্থির হইয়া পড়ে তখন, দুর্ব্বল রমণীজাতি কেমন করিয়া স্থির থাকিতে পারিবে? যাহা হউক, এই চাবি গ্রহণ কর, এবং আবাস সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দিতেছি নাও! আমি কপালকুণ্ডলাকে লইয়া, হিজলী যাইয়া বাস করিব। আমি চলিয়া গেলে, তুমি এই রটনা করিয়া দিও যে 'কাপালিক আসিয়া ঝি জামাইকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। সেখানে

পদ্মাবতীর পরামর্শ, নবকুমারের মনোমত হইল। তিনি অবিকল এইরূপ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন পদ্মাবতী তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিতে বলিলেন। নবকুমার তাহাতে সম্মত হইলে; তিনি সোলেমানকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন। "যাও, মসজেদ হইতে মৌলভি আবদুল কাদের সাহেবকে ডাকিয়া আন।" মৌলবী আবদুল কাদের, পদ্মাবতীর বাড়ীতে, ইতঃপূর্ব্বে আটজনকে মুসলমান করিয়াছিলেন; নবমে, নবকুমারের জন্য ডাকা হইল। সোলেমান চলিয়া গেলে, নবকুমার পদ্মাবতীকে বলিলেন। "কপালকুণ্ডলাকে তুমি রঘুরাণী বলিতেছ কেন? ততক্ষণ আমাকে সেই কথাটি বুঝাইয়া বল। আমাকে আর অবিশ্বাস করিও না।"

পদ্মাবতী আর কোন আপত্তি না করিয়া বলিতে লাগিলেন। "আমি মুসলমান হইবার পর; তোমাকে পাইবার জন্য বড় চঞ্চলা হইয়াছিলাম। অনেক কাঁদাকাটি করায়, পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আনিলেন। কিন্তু সমাজের অনুরোধে তুমি আমাকে গ্রহণ করিলে না। সভা পণ্ডিতদের গালাগালি খাইয়া, পিতা চলিয়া গেলেন। আমি একাই এখানে রহিলাম; পণ্ডিতদের ছয়জন বিধবা কন্যাকে জপাইয়া হাত করিলাম; এবং ছয়জন মুসলমানের সহিত, তাহাদিগকে একরাত্রে কুলের বাহির করাইয়া দিলা। হরকৃষ্ণ, তোমাকে কন্যাদান না করিয়া গালাগালী করে বলিয়া, আমার রাগ হইল। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, রঘুরাণীকে আমার 'সখের সতীন' করিব। আমি অনেক কৌশল করিয়া রঘুরাণীকে অপহরণ করিলাম। এবং তাহাকে মুসলমান করিয়া আমার নিকট রাখিলাম। কিন্তু তোমার সহিত তাহার বিবাহ দিবার কোনই পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। যখন তুমি তীর্থে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে, তখন ঐ হোসেনীকে ব্রজেশ্বর নাম দিয়া, তোমাদের সঙ্গে তীর্থে পাঠাইয়া দিলাম। হোসেনী আমার জন্য পাগল ছিল বলিয়া সে আমার সকল কথায় বাধ্য ছিল।"

নবকুমার কথা কাটিয়া বলিলেন। "হাঁ হাঁ, ঐ ব্রজেশ্বরের কথাতেই আমি হিজলীর বনে কাট কাটিতে নামিয়াছিলাম। সেটা বড় দুষ্ট, রাত্রিকালে কাট গুলি জলে ফেলিয়া দিয়া, প্রভাতে নৌকা যখন হিজলীর নিকটবর্ত্তী হইল, তখন জ্বালানী কাঠের

না, তুমি আবার তাকে চিনিবে ? বল দেখি, সোলেমানকে আরও কোথাও দেখিয় ছিলে কি না ?" নব। "কই স্মরণ হয় না।"

পদ্মাবতী আবার বলিতে লাগিলেন। "তুমি হিজলীর বনে প্রবেশ করিবার ক্ষণকাল পরে, ব্রজেশ্বর তোমার অনুসন্ধানে যায়, এবং বন হইতে সে একবার চীৎ কার করে, 'রক্ষাকর আমাদের বাঘে ধরিয়াছে।' নৌকার লোক সেই শব্দ শুনিয় ভয় পায়, এবং তোমাদিগকে বাঘে খাইয়াছে মনে করিয়া নৌকা লইয়া পলায়ন করে। ব্রজেশ্বর সেই মৃত্তিকা মন্দিরের সেবক হইয়া থাকে, এবং সেই তোমা বিবাহ দেয়। তখন তাকে চিনিতে পারিয়াছিলে কি ? গতমাত্রে, তাকে আমা পাশে দেখিয়াও চিনিয়াছিলে কি ? এই তো তোমার লোক চিনিবার শক্তি !"

নবকুমার বিস্ময়াপন্ন হইয়া, পদ্মাবতীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। "না, আমি সত্যই চিনিতে পারি নাই। নৌকায় তো ব্রজেশ্বর পরিষ্কার বাঙ্গালাভাষায় কথা বলিয়াছিল। তাই বুঝি ঐ সেবক ঠাকুর কপালকুণ্ডলাকে ব্রাহ্মণকন্যা বলিয়া আমাকে বিশ্বাস দেওয়াইয়াছিল ? তবে কাপালিক সে কে ?"

পদ্মাবতী। "তাকেও তো চিনিতে পার নাই। সে এই সোলেমান। রঘুরাণীকে কপালকুণ্ডলা নাম দিয়া, সে সেখানে যাইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিল। হোসেনী তোমাকে তাড়াইয়া বনে প্রবেশ করাইয়া দিবার পর, যাহা যাহা ঘটিল তাহা তো তুমি জান। (পাঠক ? ঠাকুরের কথার সহিত আমাদের কথা মিলাইয়া লইবেন ঠাকুর কি কি কৌশলে আসল কথা চুরি করিয়াছেন দেখিয়া যাইবেন। সত্য কথা লুকাইতে গিয়া সহস্র মিথ্যা বলিয়াও পুস্তকের সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই।)

নবকুমার বলিল। "তোমায় আমায় মেদিনীপুরের পথে দেখা হইল কেন ? তখন তুমি কোথা গিয়াছিলে ?"

পদ্মাবতী। "আমি তোমার বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, দিল্লী গমন করি। আমি যোধাবাই বেগমের প্রধানা পরিচারিকা ছিলাম। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর, যখন কুমার সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া, দিল্লীর সিংহাসনে বসেন তখন তিনি নূরজাহানকে বিবাহ করিতে চান। নূরজাহানের মনোগত কথা লইবার জন্য, বেগম আমাকে একলক্ষ টাকা পথখরচ দিয়া, বর্দ্ধমানে আসিতে বলেন।

পুরস্কার দিতে চাহিলেন। আমি আবার বঙ্গদেশে আসিলাম, কিন্তু প্রথম বর্দ্ধমানে না যাইয়া, এখানে আসিলাম। গৌরীমণি আসিয়া কাঁদিয়া আমার পায়ে পড়িল। "আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। হিজলীর বনে দাদাকে বাঘে খাইয়াছে। সোলেমানকেও সেইখানে পাঠাইয়াছ, সেও হয় তো বাঘের পেটে গিয়াছে। তুমি আমাকেও সেইখানে লইয়া চল।"

"ঐরূপ শুনিয়া, আমারও প্রাণ তোমার জন্য কাঁদিয়া উঠিল। আমি গৌরীকে সঙ্গে লইয়া হিজলীর পথাবলম্বন করিলাম। মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী একস্থলে, রঘুরাণীর পাল্কীর সহিত আমার পাল্কীর দেখা হইল। আমি তাহার নিকট সকল কথা অবগত হইলাম। তাকে চটির পথ দেখাইয়া দিয়া, গৌরীকে বলিলাম, তুমি এই পথের কিয়দ্দূর আগে গিয়া একস্থলে দাঁড়াইয়া থাকিও। প্রথম নবকুমারকে আসিতে দেখিবে। তাহাকে কিছু বলিবে না। যখন সোলেমান এবং হোসেনীকে আসিতে দেখিবে তখন তাহাদের সঙ্গে তুমিও চটিতে আসিও।" তারপর, বাহক সকলকে চটিতে পাঠাইয়া দিয়া, আমি আপনাকে পাল্কীর সহিত বন্ধন করিয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। তারপর তুমি নিকটে আসিলে যাহা যাহা ঘটিল তাহা তো তুমি জান। তুমি আমাকে চটিতে লইয়া গেলে পর, যেরূপে পেশমান বা গৌরী, সোলেমান এবং হোসেনী আসিয়াছিল, তাহাও তুমি জান। আর আমি যেরূপে তোমাদের বাসর নির্ম্মাণ করিয়া দিলাম, রঘুনাথ! সে কথা গুলি তোমার মনে পড়ে কি? এবং পাছে রঘুকে গৃহে লইতে ইতঃস্তত করে, সেইজন্য আমি তাকে অত টাকার গহনা দিয়াছিলাম। তাই বলিয়াছি রঘুরাণী আমার সখের সতীন।"

এমন সময়ে, হোসেনী এবং মৌলুভি আবদুল কাদেরকে সঙ্গে লইয়া, সোলেমান আসিয়া উপস্থিত হইল। পদ্মাবতী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। মৌলুভি সাহেব নবকুমারকে কলমা পড়াইয়া মুসলমান করিলেন; এবং তাঁহার পাওনা টাকা ও মিষ্টান্ন বাঁধিয়া লইয়া 'তসলিমাৎ' বলিয়া চলিয়া গেলেন। নবকুমার উঠিয়া সোলেমান এবং হোসেনীর সহিত গলায় গলায় মিলিয়া বলিলেন, "তোমরা বিরল গোপনে আমার যে সকল উপকার করিয়াছ; আমি সেই ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া, আজ তোমাদের দুইজনকেই প্রাণ খুলিয়া বোনাই বলিয়া ডাকিলাম।"

পদ্মাবতী পর্দ্দার পার্শ্ব হইতে বলিলেন, "ডাক, ডাক, প্রাণ খুলিয়া ডাক, উহারা ধর্ম্মতঃ তোমার বোনাই। শ্যামাও মুসলমান হইয়াছে, হোসেনীকে বিবাহ করিয়াছে।

নবকুমার পদ্মাবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি বলি কি, সোলেমান ভাইকে, আর একবার কাপালিক সাজাইলে ভাল হয় না! আমাদের স্ত্রীপুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়া হিজলী লইয়া যাইবে! তাতে তো কোনই গোল ঘটিতে পারে না।"

পদ্মাবতী সানন্দে বলিলেন, "কলমাটি পড়িবা মাত্র, তোমার চিরদুর্ব্বল মাথায় যে, এক অপরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখা দিয়াছে! অভিনয়টি অতি পরিষ্কার হইবে। তাহাই করিব। এবং সকলে হিজলী যাইয়াই বাস করিব।"

পরন্তু সোলেমান কাপালিক সাজিয়া, নবকুমারের বাড়ী গমন করিল; এবং তাঁহার মাতার নিকট হইতে, কন্যা জামাতাকে হিজলী লইয়া যাইবার অনুমতি লইল, দিন স্থির করিয়া তাঁহারা ইহাদিগকে বিদায় দিলেন। দেশের লোক জানিল, নবকুমার সপত্নীক হিজলী গমন করিলেন। তাঁহাদের মুসলমান হওয়ার কথা সপ্তগ্রামে প্রকাশ পাইল না। (এই সকল কথা গোপন করিতে ঠাকুর হজমিগুলির পাল্লায় পড়িয়াছিলেন, তথাপি কল্পনার সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই। সংবাদপত্রের প্রভুরা এইরূপ গ্রন্থের প্রশংসা করিয়া, এবং মাইকেলের অপযশ গাহিয়া, নিজেদের বুদ্ধিরবহর দেখাইয়াছেন মাত্র। —কল্পনাহীন মাথা লইয়া এই জাতি স্বাধীন হইবে!)

পদ্মাবতীর হস্তগত সেই ছয়জন বিধবা এবং তাহাদের স্বামীরাও ছিল। তিনি সকলকে সঙ্গে লইয়া, স্বীয় সুদীর্ঘ বজরা সাজাইতে লাগিলেন। নির্দ্ধারিত দিনে কাপালিক ওরফে সোলেমান, নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলা বা মৃণ্ময়ীকে সঙ্গে করিয়া স্বতন্ত্র নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক ভাগীরথী নদী বাহিয়া চলিলেন, কতকদূর যাইয়া পদ্মাবতীর বজরার সাক্ষাৎ পাইলেন এবং তখন তিনি সে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া বজরারোহণ করিলেন। সকলে মিলিয়া সতের জন হইল, আর এক শিশু।

তাঁহারা রূপনারায়ণ নদীর মিলিত স্থল ত্যাগ করিয়াও একবেলা নৌকা বাহিয়া এক সুন্দর স্থল দেখিয়া, বজরা কিনারায় ভিড়াইলেন। এবং সেইখানে বনকাঠে আবাস নির্ম্মান করিলেন। সেইস্থল এখন রঘুনাথপুর।

আমরা সরল কথায়, সম্রাট ঠাকুরের ভিত্তি বজায় রাখিয়া, কেবল স্থানে স্থানে তাঁহার কল্পনার, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন করিয়াছি মাত্র। আমাদের লেখায় জ্যোতি নাই। আমরা সে জ্যোতির বিচারও চাহিতেছি না। জ্যোতি নাই বলিয়া অবশ্যই পতঙ্গবুদ্ধি ব্যক্তির নিকট আমরা আদর প্রাপ্ত হইব না। কেন না শিশুর নিকট একপয়সা মূল্যের রংকরা ছবির আদর আছে কিন্তু হাজার টাকার নোটের আদর নাই। আমরা শিশুর নিকট সমাদৃত হইতেও চাহিনা। সম্পূর্ণ।

যুগলাঙ্গুরীয় বা সত্যসাধ্বী

আমাদের নভেল ঠাকুরের ১৪ খানি নভেলের মধ্যে এই যুগলাঙ্গুরীয়খানি যেন নভেল প্ল্যানে লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অবশিষ্ট ১৩ খানিই, নভেলের সীমা-অতিক্রম করিয়া, কাব্যের সীমা ও গাল-গল্পাদি গ্রন্থের সীমা অধিকার করিয়াছে। আমরা সে সকলের সমালোচনা যথা সময়ে করিব।

যুগলাঙ্গুরীয়তেও, লেখকের সপ্তগ্রাম বা নির্দ্ধারিত সাত কল্পনার মধ্যে কয়েকটি কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা বড় একটা দোষনীয় হয় নাই। এ গ্রন্থে কোন ভৌতিক কথা সন্নিবেশিত হয় নাই। তবে পুরন্দরের কোষ্ঠী লইয়া যে কয়েকটি কথা বলা হইয়াছে, তাহাতেও দোষ জন্মায় নাই।

কাশীতে যাইয়া বিবাহ—বর ক'নের চক্ষু বন্ধ করিয়া সম্প্রদান, সামাজিক নিয়মের অন্তর্গত না হইলেও, নভেলে চলিতে পারে। হিরণ্ময়ীর সতীত্বের উপর আমরা কিছুতেই সন্দিহান নই। তবে লেখকের ব্যক্ত করিবার দোষে, একস্থানে তাহার সতীত্বের উপর আঘাত পড়িয়াছে। আমরা লেখকের সে স্থলের কল্পনা ত্যাগ করিয়া আমাদের কল্পনায় সাজাইয়াছি। গল্পটি লেখকের সকপোল-কল্পিত অথবা অপহৃত ধন, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় জন্মিতেছে।

হিরণ্ময়ীকে আমরা সাধ্বী স্ত্রী বলিব; কেন না লেখক তাঁহাকে শৈবলিনী, সূর্য্যমুখী, হীরা, পদ্মাবতী (লুৎফুন্নিসা) শ্রী, রমা, ইন্দিরা, প্রফুল্ল, মৃণালিনী, মনোরমা, শান্তিমণি, কল্যাণী, বিমলা, রজনী ও রোহিণী আদি রমণীদের মত লজ্জার নালায় ডুবাইয়া আবার সতী বলিয়া প্রমাণ করিতে দাঁড়ান নাই। হিরণ্ময়ী কুলের বাহির হইয়া, পথে পথে ভ্রমণ করেন নাই। তিনি যে কয়েকদিন দুরবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন, সে কয়দিন কেবল যে অমলার রক্ষণাবেক্ষণায় ছিলেন তাহা নহে; তাঁহার জন্য ধর্ম্মপরায়ণ রাজা মদনদেবের বিশ্বাসোপযোগী সাক্ষ্য পাইয়াছি। সেহেতু উপরোক্ত নারীবৃন্দের ন্যায়, হিরণ্ময়ী নিজে নিজের জন্য সাফাইয়ের সাক্ষী নহেন, কাজেই হিরণ্ময়ীকে সাধ্বী বলিব। তবে রাজা ইঁহাকে লইয়া আংটি দেখাইয়া, যে এক রুচিব্য খেলা দিয়াছিলেন, সে কল্পনা আমাদের নিকট আদর পাইতে

পারে না। আমরা সে কল্পনাও ঘুরাইয়া সৌষ্ঠব করিয়া দিলাম।

যুগলাঙ্গুরীয় একটি ক্ষুদ্র গল্প মাত্র। আমরা নিম্নে সেই গল্পটির সারাংশের উপর, পরিশেষে কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া প্রকাশ করিলাম।

১ * মিলনবিহীন বিবাহ। * ১

তমলুক নিবাসী ধনদাস বণিকের রূপবতী কন্যার নাম—হিরণ্ময়ী এবং ঐ নগরের শচীসুত বণিকের পুত্রের নাম পুরন্দর। ইহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি-বাসী। পুরন্দর এবং হিরণ্ময়ী বাল্যকাল হইতে একত্র খেলা ও একত্র স্নান-পান করিত। উভয়ের পিতামাতা, প্রতিবাসী ও আত্মীয়-স্বজন, পুরন্দরের সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহ দিতে সোৎসাহে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বিবাহের দিন স্থির হইল; এমন সময়ে ধনদাসের কুল-গুরু আনন্দস্বামী তমলুকে আসিলেন। পুরন্দরের কোষ্ঠি দেখিয়া বলিলেন,—"পুরন্দরের পরমায়ু অশীতি বৎসর; কিন্তু মধ্যে এক ফাঁড়া আছে। ২৮ বৎসরের মধ্যে যদি পুরন্দর স্ত্রী সহবাস না করে, তবে ঐ ফাঁড়া কাটিয়া যাইবে। নচেৎ ঐ বয়সের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে।"

এই কথা প্রতিবাসীর নিকট গোপন রাখিয়া, ধনদাস সহসা ঘোষণা করিয়া দিলেন,—"আমি আমার কন্যার বিবাহ দিব না।" শচীসুত, পুরন্দরকে বাণিজ্যো-পলক্ষে, সিংহলে পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পুরন্দর সিংহলে যাইবার পূর্ব্বে সাগরেশ্বরী দেবী দর্শনে যান। (কেহ বলেন বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক, কেহ বলেন রাজা তাম্রধ্বজ কর্ত্তৃক, সেই মন্দির তথায় সংস্থাপিত হইয়া একাল পর্য্যন্ত, অটল ও অচল ভাবে বিরাজ করিতেছে। চিরাত্যাচারী রূপনারায়ণ নদী এই মন্দিরের প্রতিপার্শ্বে অত্যাচার করিলেও, ইহাঁর উপর কখনও করে নাই। এই মন্দির সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা আছে, ঠাকুর তাহা জানিলে অবশ্য বলিতেন। আমরাও তাহা বলিতে চাহি না।) ফলকথা সেই মন্দিরে পুরন্দরের সহিত হিরণ্ময়ীর বিদায়ী সাক্ষাৎ হইয়া গেল।

পুরন্দর, হিরণ্ময়ীর নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"আমি সিংহলে যাইব,—যাহা হউক, তুমি আমার বাল্য-সখী, আমি তোমার সহিত শেষ দেখা-শোনা করিতেছি।"

হিরণ্ময়ী পুরন্দরের মুখ পানে একবার মাত্র চাহিয়া নতশিরা হইলেন। তখন তাঁহার নয়নযুগল বারিপূর্ণ হইয়াছিল। চক্ষুজল মুছিয়া যেন সভয়ে কাঁদিলেন

"ফিরিবেন কবে ?" পুরন্দর বলিলেন,—"আর ফিরিয়া কি করিব। কাহার জন্যই বা ফিরিব ! যখন তোমা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, তখন জগৎ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। এদেশ অপেক্ষা সেই দেশই আমার জন্য ভাল হইবে।" হিরণ্ময়ী আর উত্তর করিতে পারিলেন না, কে যেন তাঁহার গলদেশ চাপিয়া ধরিল। পুরন্দরের মুখখানি, আর এক পলকের চাহুনিতে দেখিয়া লইবার সাধ ছিল, কিন্তু কে যেন তাঁহার ঘাড়ে শীলা চাপাইয়া দিল ; কিছুতেই তিনি, আর মুখ তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়ন যুগল ভাসিয়া এরূপ অজস্রধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল যে, তিনি আর সেস্থানে দাঁড়াইতে পরিলেন না। নতশিরে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। হিরণ্ময়ী চলিয়া গেলে, পুরন্দরের মনে ভয় হইল। তিনি ভাবিলেন,—'কেহ যদি হিরণ্ময়ীকে কাঁদিতে দেখে, সে মনে করিবে, আমি উহাকে কিছু বলিয়া কাঁদাইয়াছি।' এই ভাবিয়া পুরন্দরও সজল নয়নে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। উভয়ের ভাব-ভঙ্গিতে বেশ প্রকাশ পাইল যে, উভয়েই উভয়ের অন্তর দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উভয়েই উভয়ের নয়নবাণে আহত হইয়াছিলেন।

এই মন্দিরের সম্মুখেই রূপনারায়ণ নদী, লেখক বলিতেছেন মন্দির তখন সমুদ্র-তীরে ছিল। যাহা হউক ঐ স্থলের সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়া শেষ করিবার নহে। লেখকের ন্যায় সুদক্ষ কবি ঐ অপরিসীম শোভার বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করিলে, আমাদের নভেল পড়া ঘুরাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি অনুগ্রহ করিয়া নভেলের সীমা অতিক্রম করিয়া ঐ চিত্রাঙ্কনে মনোযোগী হন নাই। তাই তিনি প্রশংসনীয়।

পুরন্দর সিংহলে গমন করিলেন। দুই বৎসর তথায় থাকিবার পর তাঁহার পিতার নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়া, উপদেশমত সিংহল হইতে একাকী কাশী যাত্রা করিলেন এবং ঐ সময়ে কুল-গুরুর আদেশে, ধনদাস তাঁহার কন্যা হিরণ্ময়ীকে লইয়া, কাশী গমন করিলেন, সেই স্থলে এই নভেলিক বর এবং ক'নের চক্ষু চারিটি বস্ত্রাবদ্ধ করিয়া, পুরন্দরের সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহ হইল। বর এবং ক'নের মধ্যে, কে কাহাকে বিবাহ করিল, তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না। এইরূপে অজ্ঞাতসারে বিবাহ এবং কন্যা-সম্প্রদান কার্য্যের শেষ হইলে, আনন্দ-স্বামী, এক নমুনার দুইটি অঙ্গুরীয়, দুইজনের অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"এই অঙ্গুরীয় তোমারা পাঁচ বৎসরকাল কেহ পরিও না, হারাইও না, বেচিও না অতি যত্নে ইহা তুলিয়া রাখিও। এই অঙ্গুরীয় দেখিয়া তোমরা, স্ত্রী এবং স্বামী,

পাঁচ বৎসর পর, চিনিয়া লইতে পারিবে। পরন্তু ইহা হারাইলে, তোমরা তোমাদের স্ত্রী বা স্বামী হারাইবে।”

এইরূপ অন্ধকারে বিবাহ হইবার পর, ধনদাস তাঁহার কন্যা হিরণ্ময়ীকে লইয়া তমলুকে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং শচীসুত তাহার পুত্র পুরন্দরকে কাশী হইতে পুনরায় সিংহলে পাঠাইয়া দিলেন। কিছুদিনের পর হিরণ্ময়ীর পিতার মৃত্যু হইল এবং তাঁহার মাতা স্বামীর অনুমৃতা হইলেন। হিরণ্ময়ী শোকের উপর শোক পাইয়া, একাকিনী পিত্রালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। ধনদাসের বিস্তর দেনা ছিল, মহাজনেরা হিরণ্ময়ীর নিকট হইতে টাকা চাহিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী দেখিলেন দেনা সত্য। অগত্যা ঘর-দ্বার, বিষয়-সম্পত্তি যেখানে যাহা ছিল, সবকিছু বিক্রয় করিয়া; মহাজনের দেনা পরিশোধ করিলেন। এখন থাকিবার স্থান নাই।

অমলা নাম্নী এক বিধবা সেই গ্রামের প্রান্তভাগে বাস করিত। তাহার কয়েকটি সন্তান ছিল। হিরণ্ময়ী তাহারই আশ্রয়াধীনা হইয়া, দুঃখে-সুখে তাহার সহিত মিলিয়া-মিশিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ধনদাসের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া আনন্দ-স্বামী, অতি গোপনে তমলুকে আসিলেন; এবং তথাকার ধর্ম্মপরায়ণ রাজা মদন-দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার নিকট, হিরণ্ময়ীর যাবতীয় গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া, সেই হতভাগিনীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করিয়া যান। রাজা তাঁহার অনুরোধ পালন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

২ ❋ কষিত কাঞ্চন। ❋ ২

বিবাহের দিন হইতে প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে, অর্থাৎ পুরন্দরের বয়স প্রায় ২৮ বৎসর হইলে, পিতার আদেশে তিনি দেশে আসিলেন। তিনি বিস্তর ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। নৌকা বোঝাই করিয়া অর্থ আনিলেন। তাঁহার আগমনে তমলুকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। একরাত্রে অমলা হিরণ্ময়ীর নিকট পুরন্দরের ধনের গল্প করিল। হিরণ্ময়ী তাহা নীরবে শুনিয়া, নীরবে নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তিনি মনে মনে এই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, “যদি পুরন্দরের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া থাকে তবেই মঙ্গল। নচেৎ তাঁহার অদৃষ্টে সুখ নাই।”

রাজা মদনদেব, অমলাকে দিয়া অবিরত হিরণ্ময়ীকে সাহায্য করিতেন এবং সেই জন্যই যে, অমলা তাঁহার সহিত অষ্ট প্রহর শিষ্ট ব্যবহার করিত, তাহা তিনি

কখনই বুঝিতে পারেন নাই। একদিন রাজা, অমলার হাতে এক হীরার হার দিয়া বলিলেন,—"পুরন্দর, হিরণ্ময়ীকে এই হার উপহার দিয়াছেন, তুমি ইহা তাহাকে দিও।" অমলা সেই হার হিরণ্ময়ীকে দিল। হিরণ্ময়ী তাহা হাতে লইয়া কতক্ষণ তাহার উপর চক্ষের জল ফেলিয়া, শেষে তাহা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"পুরন্দর আমার কে? আমি কেন তাঁহার হার গ্রহণ করিব।" অমলা সে হার রাজাকে ফিরাইয়া দিল।

আর একদিন অমলা, হিরণ্ময়ীকে যাইয়া বলিল,—"তোমার পিতার বাস্তবাটী পুরন্দর খরিদ করিয়া লইয়াছেন। তিনি তোমাকে সেই বাড়ীতে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন।" হিরণ্ময়ী আপন কপালে হাত রাখিয়া কতক্ষণ কাঁদিয়া-কাটিয়া অবশেষে পিতার আবাসে বাস করাই স্থির করিলেন. এবং অমলাকে সঙ্গে লইয়া, সেই শোক-সঙ্কুল ভবনে বাস করিতে লাগিলেন।

/একদিন রাজার নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে, 'হিরণ্ময়ী! তোমাকে রাজা স্মরণ করিয়াছেন; তুমি এইক্ষণে, পালকী করিয়া তথায় চল।' রাজা মদনদেব অতিভদ্রলোক এবং সজ্জন; হিরণ্ময়ীর তথায় যাইতে কোন সন্দেহ বা, আপত্তি হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ শিবিকায় বসিয়া রাজ-ভবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

সন্ধ্যাহারের পর, রাজা তদীয় পরিচারিকাদিগকে বাসর সাজাইবার অনুমতি করিয়া, হিরণ্ময়ীকে লইয়া বারান্দায় বসিলেন এবং তাঁহাকে একটি আংটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই আংটি চিনিতে পার কি?" হিরণ্ময়ী সেই আংটি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, ইহা তাঁহার সেই বিবাহের আংটির জোড়া, বলিলেন,— "এ আংটি আপনি কোথায় পাইলেন?"

রাজা বলিলেন,—"ইহা, তোমাকে বিবাহ করিয়া পাইয়াছি। আর আমাকে বিবাহ করিয়া, তুমিও ইহার অনুরূপ আর একটি পাইয়াছ। এখন তুমি আমার পত্নী; আমাদের নির্দ্ধারিত পাঁচ বৎসর সময়ও অতিবাহিত হইয়াছে। আজ তোমাকে লইয়া বাসর উজ্জ্বল করিব।" (এখানে লেখকঠাকুর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দুই একটি অপ্রিয় কথা, হিরণ্ময়ীর বেনামে রাজার প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহা রাজ-গৌরব ও নারী মর্য্যাদার হানিজনক কথা বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। রাজাকে 'চোর' বলা বা রমণী হইয়া, মনে মনে অন্য কাহাকে প্রাণ সমর্পণ করা, উভয়ই অমার্জ্জনীয় দোষ। যে রাজা এইরূপ এক নরঅস্পর্শা পরস্ত্রীর সহিত এইরূপ একটি রসালাপের ক্রীড়া করেন, সেরূপ রাজা ধার্ম্মিক নহেন। এইস্থলে আমরা লেখকের কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের কল্পনায় সাজাইয়া দিব।

এইরূপ শুনিয়া হিরণ্ময়ীর চক্ষুদ্বয় অন্ধকার হইয়া আসিল। আপন কপালে হাত রাখিয়া, পুতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন,—"হিরণ্ময়ী, তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমাকে কি পছন্দ করিতেছ না?" হিরণ্ময়ী কোন উত্তর করিলেন না।

রাজা আবার বলিলেন,—"তুমি কি বিবাহ নামঞ্জুর কর। তুমি যাহা বলিতে চাও খুলিয়া বল? আমি তোমাকে কাঁদিতে বা কাঁদাইতে ডাকি নাই।" হিরণ্ময়ী চক্ষের জল মুছিয়া, হৃদয়ে সাহস বাঁধিয়া বলিলেন,—"আমি আমার মুদিত নয়নে কল্পনা করিয়া, যাঁহাকে মনে করিয়া বরমাল্য পরাইয়াছিলাম; আমি তাঁহাকেই স্বামী বলিয়া একাল পর্য্যন্ত ধারণায় আঁকিয়া রাখিয়াছি! আজ সেই কল্পনা, সেই ধারণা অসার ও অমূলক সাব্যস্ত হইতেছে বলিয়া আমি রোদন করিতেছি এবং যাঁহাকে আমি কখনও কল্পনা করি নাই, তাঁহার বাসরে শয়ন করিতে, আমি আমার সাবিত্রীনিভ সুরম্য চরিত্রকে, অভিসারিকা বলিয়া গালাগালি দিতেছি। আমি অসতী নহি, ভ্রষ্টা নহি, আমার কল্পনা কেন অন্যথা হইবে? তাহাই ভাবিয়া কাঁদিতেছি।" (যাহাদের প্রাণ পরিষ্কার তাহাদের কল্পনাও পরিষ্কার হইয়া থাকে। জঙ্গলে হিংস্রক জন্তুই বাস করে, নগরে করে না।)

রাজা তাঁহার পবিত্র চরিত্রের পরিচয় যথেষ্টরূপে পাইয়া, মনে মনে আনন্দিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কল্পনায় কখন বিবাহ হইয়া থাকে? কল্পনায় স্থান দিয়া, যদি সে দিন তুমি চাঁদকে বরমাল্য পরাইয়া থাক, আজ কি তুমি চাঁদ পাইবার প্রত্যাশা করিবে?"

হির—"কল্পনাই, হিন্দুজাতির একমাত্র সোপান। যদি এ সোপান মিথ্যা হয়, যদি এ সোপান ধরিয়া মানস-মন্দিরে প্রবেশ করা না যায়, তবে—" হিরণ্ময়ী ক্রমশঃ ওজস্বিনী ভাষায় রাজাকে রোমাঞ্চিত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তবে, আজ আমি উন্মাদিনীর মত কার্য্য করিব!—হিন্দুদের যত দেবতা-দেবী, চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া জলে ভাসাইব; তবে—তবে—আপনাকে লইয়া বাসরে প্রবেশ করিব।" রাজা তাহার ভাবপূর্ণ কথায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া বলিলেন,—"দেবতা-দেবীর উপর রাগ করিবার কারণ কি হইল?"

হিরণ্ময়ী—"হিন্দুর কল্পনা যদি মিথ্যা হইল, তবে দেবতারাও মিথ্যা নহে কি? মাটির পুতুলকে, কল্পনায় শ্রীকৃষ্ণ, মা-দুর্গা, শিব ইত্যাদি স্থির করিয়া কেন পূজা করিয়া মরি? আমাদের হাতে গড়া ঐ সকল প্রতিমা কি আমাদের

কল্পনানুযায়ী—আমাদের ধারণানুরূপ, সত্য শ্রীকৃষ্ণ, সত্য মা-দুর্গা ও সত্য শিব প্রভৃতি দেবতাদিগকে আমাদের এই পূজা পৌঁছিয়া দিতে পারিবে? যখন সাধ্বী স্ত্রী হইয়াও আমার কল্পনা, আমার পরম পূজনীয় ব্যক্তিকে, পূজা পৌঁছিয়া দিতে পারিল না, তখন আপনাদের কল্পনাই কি পারিবে?"

হিরণ্ময়ীর কথায় রাজার জ্ঞানোদয় হইল, তথাপি তিনি বলিলেন,—"আমি তোমার কথায় সন্তুষ্ট হইলাম এবং বিশ্বাস করিলাম তুমি সাবিত্রীর ন্যায় সাধ্বী, তোমার কল্পনা নিশ্চয়ই সত্যে পরিণত হইবে—সাবিত্রীর অনুরোধে সত্যবান জীবন পাইয়াছিল, তোমার অনুরোধে আমিও তোমার কল্পিত স্বামীর কায়া ধারণ করিব, তাহাও আমার বিশ্বাস। অতএব যতক্ষণ বা যতদিন পর্য্যন্ত আমার কায়া বিনিময় না হয়, ততক্ষণ বা ততদিন পর্য্যন্ত আমি তোমার অঙ্গস্পর্শ করিব না, ইহা আমি তোমার সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিলাম। সম্প্রতি আমি তোমাকে আমার গৃহে আনিয়াছি। অদ্য রজনী তুমি আমার রচিত বাসরে শয়ন করিবে কি না?"

হিরণ্ময়ী—"যদি আমাকে একা শয়ন করিবার অনুমতি দেন, তবে করিব আর যদি আপনিও শয়ন করেন, তবে হিন্দু দেবালয়ে মানব-নির্ম্মিত পুতুল সকল স্থান পাইবে না।" রাজা—"তথাস্তু, তুমি একাই ঐ বাসরে গিয়া শয়ন কর গে। কিন্তু তুমি যদি সত্য সাধ্বী হও, তবে এখনই তুমি আমার কায়া বিনিময় করাইতে পারিবে। আর যদি এখনি আমাকে তোমার পার্শ্বে স্থান দান করাইতে না পার—তবে, হিরণ্ময়ী! আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব—তুমি অসতী।" এই বলিয়া রাজা স্বতন্ত্র কক্ষে শয়ন করিতে গেলেন।

৩ ❋ সতীর প্রাণে পতি। ❋ ৩

বাসর মন্দিরখানি আলোপাঁতিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। পালঙ্কের চতুর্দ্দিক কুসুমদামে হাসিতেছে। ঝালরসহ মশারী ঝলমল করিয়া বাতাসে দুলিতেছে। ভিতরে দুইজন শয়ন করিবার মত সুবিস্তৃত স্থান, মখমল বালিশে হাসিতেছে। একজন পরিচারিকা হিরণ্ময়ীর হাত ধরিয়া, এই বাসর মন্দিরে আসিয়া, নিশার ব্যবহার্য্য সামগ্রী সমূহ দেখাইয়া দিল। শয়নাগারের পার্শ্বে ক্ষুদ্র জলহাগার দেখাইল এবং পালঙ্কের উপর শয়ন করিতে উপদেশ দিয়া, চলিয়া যাইবার সময়; দ্বার সকল বন্ধ করিয়া লইতে বলিয়া গেল।

পরিচারিকা চলিয়া গেলে হিরণ্ময়ী কক্ষের দ্বার সকল অবরুদ্ধ করিলেন। যে কয়টি বাতায়ন লৌহ জালাবৃত ছিল তাহার খড়খড়িগুলি খুলিয়া দিলেন। অবশিষ্ট সকল, এরূপে বন্ধ করিলেন, যেন একটি মার্জ্জার পর্য্যন্ত গৃহে প্রবেশ করিয়া অনধিকার চর্চ্চা করিতে না পারে।

এইরূপে সকল কার্য্য সারিয়া, পালঙ্কের মশারীর পার্শ্বে পদলম্বন করিয়া বসিলেন এবং করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমি অসতী! রাজা কেন বলিলেন,—'হিরণ্ময়ী তবে তুমি অসতী!' আমার যদি সাধ্যারত্তই হইত, তথাপি আমি রাজার কায়া বিনিময় করিব কেন? তাঁহারই বা কায়া বিনিময় হইবে কেন? কায়া বিনিময় কি এতই সহজ কথা যে, আমার ইচ্ছায় হইবে?—তবে কি আমি অসতী হইলাম? ঈশ্বর স্থানে কি বিচার নাই, দেবতা-দেবীরা কি দেখেন নাই, আমি পাপ না করিয়া অসতী হইব?" সহসা কক্ষের মধ্যে 'এক শোঁ শোঁ, গুড় গুড়' শব্দ হইল। হিরণ্ময়ী চমৎকৃতা হইয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিলেন। কক্ষের উত্তর-পূর্ব্ব কোনের দিকে চাহিতে সবিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন, এক যুগল দেবতা-দেবীর জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি,রাধার সহিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন। দেব-দর্শনে হিরণ্ময়ীর পবিত্র প্রাণ ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিয়া ভক্তিভাবে নিবেদন করিলেন—"যদি দয়া করিয়া, অভাগিনীর জন্য, ধরা-ধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তবে দয়া করিয়া বলিয়া যান—আমি সতী অথবা অসতী। আপনাদের দৃষ্টির অগোচর কিছুই নাই। বিনা অপরাধে কল্য প্রভাতে, আমি কেমন করিয়া জগজ্জনের সম্মুখে অসতী হইয়া দাঁড়াইব? যদি আমি সত্য সত্যই সতী হই, যদি স্বপ্নেও কখন পর পুরুষের চিন্তা না করিয়া থাকি, তবে আমায় রক্ষা করুন।

অমনি শ্রীকৃষ্ণের করস্থিত বাঁশী বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বিনা বিনিন্দিত স্বরে শ্রীরাধা সেই বংশীধ্বনিসহ গান করিলেন।—

"তুমি সতী, তুমি সতী, আমি কুল কলঙ্কিনী।
ধর পর মম বেশ, উড়ি আমি পতঙ্গিনী।"

এই বলিয়া শ্রীরাধা পলকে তাঁহার বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুৎবেগে ধরাগর্ভে অবতীর্ণা হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ গান করিতে লাগিলেন,—

"পর এ বেশ হেসে হেসে,
দাঁড়াও আমার কাছে ঘেঁসে
এস রাধা বিনোদিনী তুমি মম অর্দ্ধাঙ্গিনী।"

হিরণ্ময়ী যেন আত্মবিস্মৃতা হইয়া, সেই বেশ-ভূষা পরিধান করিলেন। একবার শ্রীকৃষ্ণের মুখপানে চাহিলেন এবং যেন বিবশা হইয়া তাঁহার পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই যুগলাঙ্গুরীয়ের একটি অঙ্গুরীয় স্বীয় অঙ্গুলী হইতে খুলিয়া হিরণ্ময়ীর অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলেন। হিরণ্ময়ী সেই অঙ্গুরীয় দেখিয়া ভাবিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ আর কেহই নহে, সেই রাজা মদনদেব। কৌশলের সহিত আমার সতীত্ব হরণ করিতে চাহিতেছেন।" এই ভাবিয়া তাঁহার পার্শ্ব হইতে সরিয়া, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং উচ্চ বচনে বলিতে লাগিলেন,—"আপনি রাজা,আপনিও অবিশ্বাসী! আপনিও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন, আপনিও রমণীর উপর জাল করিয়া থাকেন— কিন্তু আপনি যাহাই মনে করুন, হিরণ্ময়ীর একটি লোমও কখনও অবিশ্বাসী হয় নাই, হইবেও না —হিরণ্ময়ীর জীবন অপেক্ষা সতীত্বের মূল্য অধিক।"

অমনি সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বেশ পরিত্যাগ করিয়া হিরণ্ময়ীর পার্শ্বশোভী হইয়া দাঁড়াইলেন। হিরণ্ময়ী শ্রীকৃষ্ণের মুখ পানে চাহিয়া, নতশিরা হইলেন। 'ইনি যে পুরন্দর!' পুরন্দর তাঁহার চিবুক ধরিয়া, মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"তুমি কি সাগরেশ্বরের মন্দিরপ্রাঙ্গণ মনে করিয়াছ যে, নতশিরে কাঁদিয়া আর কাঁদাইয়া চলিয়া যাইবে?" হিরণ্ময়ী আহ্লাদাশ্রু বিগলিত লোচনে পুরন্দরের পানে চাহিয়া বলিলেন,—"আমাকে স্বরূপ বলিবেন, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?—আমরা রাজভবনে কেন? রাজাই বা আমার প্রতি আকাঙ্ক্ষা করিলেন কেন?"

পুরন্দর। "তুমি কাহাকে কল্পনা করিয়া, আবদ্ধ নয়নে বরমাল্য পরাইয়াছিলে?" হিরণ্ময়ী। "তোমাকে?" পুর। "আমি কাহাকে কল্পনা করিয়া মাল্য পরাইয়াছিলাম?" হির। "আমি ভাবি, আমাকেই।" পুর। "আমি আমার পবিত্র কল্পনার পুণ্যবলে, রাজা মদন দেবের কায়া পাইয়াছিলাম।—কিন্তু তুমি সতী, তোমার কল্পনার পুণ্যবল, আমার অপেক্ষা অধিক হইবার কারণে, তুমি আমাকে রাজা মদনদেবের কায়া হইতে আবার পুরন্দর করিয়া দিলে।"

হিরণ্ময়ী পুরন্দরের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন,—"আমাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিবেন না?" পুরন্দর। "বলিব আর কি, আমিই রাজা সাজিয়া সন্ধ্যাকালে তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম—তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছ।" এই বলিয়া উভয়ে পালঙ্কের দিকে অগ্রসর হইলেন।

৪ ❋ এ চিন্তা কেহ করেন কি ? ❋ ৪

বঙ্গবাসী যে একেবারে অধঃপতিত জাতি ইদানীং তাহা তাঁহারা নিজ নিজ মুখেই

স্বীকার করিতেছেন। স্বীকার করিলে কি হইবে, কাকাতুয়ার কথার মত তাঁহাদের কথার অর্থ থাকিলেও ভাব নাই। ভাব থাকিলে অবশ্যই তাঁহারা উঠিবার চেষ্টা করিতেন।—তাঁহারা কেন পতিত হইলেন, তাহার কারণ জানিবার জন্য যত্ন, এবং কি করিলে পতিতবুদ্ধি মাথা হইতে অপসারিত হইবে সে দিকে লক্ষ্য করিতেন।—কি কি দোষে এ জাতি এইরূপ ভীষণ ভাবে পতিত হইয়াছে সে কথার কোন আলোচনা এ দেশে আছে কি? নেতৃবৃন্দ হইতে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিরাও বলেন, 'আমরা পতিত' কিন্তু কি দোষে পতিত হইল এবং কি করিলে দাঁড়াইতে পারিবে, সে কথা কাকাতুয়ারাও ভাবেনা আমরাও ভাবিনা। পতিত জাতির জন্য, ইহা যে ভাবিবার বিষয় নহে, সে কথাও কাহারও চিন্তায় উদয় হয় না। সকলেই বুঝিতে পারে যে, সাহিত্যই উন্নতি করিবার প্রধান সোপান, কিন্তু কেহ এমন বোঝেন কি যে, যদি সেই সাহিত্য-সোপান জীর্ণ বংশদণ্ডে রচিত হইয়া থাকে, তবে উন্নতির অর্দ্ধপথে আরোহণ করিয়া সোপান সহ ভূতলে পতিত হইতে হইবে। অতএব যদি দেশের পতিত ভাব দূরীভূত করাই অভিপ্রায় হয় তবে, দুষ্য সাহিত্য সকলের তীব্র সমালোচনা করা আবশ্যক নহে কি? এবং যত দিন না সহস্র কণ্ঠী-সমালোচনায় দুষ্য সাহিত্যের দোষ রাশি জনসাধারণের মাথায় মাথায় ফুটাইয়া দেওয়া হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এ জাতি, অনন্তভ্রান্তির অশান্তঅর্ণব হইতে উদ্ধার পাইবে কি? বঙ্গসাহিত্যই যে বঙ্গবাসিকে পতিত করিয়া রাখিয়াছে তাহা কি কেহ স্বীকার করিবেন না?

যখন যে জাতি পতিত হইতে থাকে, তখন তাঁহাদের মধ্যে উদ্ভ্রান্ত কবিরাই উদ্ভুত হইয়া থাকেন। পাঠকেরা পতন-মতি জাতি হইবার কারণে তাঁহাদের ভ্রান্তিমান পুস্তক সকলের উপাসক সাজিয়া বসেন, যাহার ফলে সমগ্র দেশ এমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া দাঁড়ায় যে, আর তাহারা কোন কাজেরই উপযুক্ত থাকেনা। বাঙ্গালার অবস্থা অবিকল সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে কি না তাহা এ দেশের কেহ বলিতে পারেন কি? বঙ্কিম-সমালোচনা পড়িয়া আমাদের কথা সপ্রমাণ করিয়া লইবেন কি? এবং দেশের ঘাসভরা মাথায় চাষ দিতে, সকলেই এক যোগে দাঁড়াইবেন কি? অথবা পতিত-জাতি-সম্ভব প্রত্যুত্তরে বলিবেন, 'এই একতার সময়ে বঙ্কিম-সমালোচনা প্রকাশ করা কি শোভা পায়?' এবং কিছুতেই বিবেচনা করিতে পারিবেন না যে, এই সময়েই ঐরূপ গ্রন্থের সমালোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সম্পূর্ণ।

ইন্দিরা বা ডাকিনী

১ * দেশ, দেশবাসী, ভাষা, ভাব ও ধর্ম্ম। * ১

ভারতের ইতিহাসে লিখিত আছে,—'বঙ্গান্ উৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্ নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু সঃ।' যে সময়ে মহারাজ রঘু,বাঙ্গালীকে শাসন করিবার জন্য, বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন; তখন বঙ্গদেশ, বঙ্গবাসী এবং তাহাদের ভাষা, ভাব ও ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি কিরূপ ছিল, তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে আমরা অক্ষম হইলেও অনুমান করা যায় যে, তখন এদেশ ঐ সকল বিষয়ে উন্নত ছিল। ইহা রামায়ণ যুগের অবস্থা। মহাভারত যুগেও এই দেশ, দেশবাসী, ভাষা-ভাব এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি প্রায়ই ঐরূপ ছিল। বৌদ্ধযুগে মহারাজ অশোক এতদ্দেশীয় ভাব ও ভাষার সমাদর করিয়াছিলেন। এই যুগে দেশবাসীদের ধর্ম্মভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া দেশ, ভাষা ও ভাবেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের সময়, ঐ বৌদ্ধভাব তিরোহিত হওয়ায় দেশ, ভাষা, ভাব ও ধর্ম্মাদি মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করিল; এবং ঐ ভাবেই রাজা লক্ষ্মণসেনের সময় পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর হইতে এতদ্দেশীয় ধর্ম্মভাব অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

মুসলমানদের সময়ে, তাঁহারা এদেশকে ভাবান্তরে বিরচিত করিলেন। দেশবাসীরা মুসলমানদের আচার-ব্যবহার ও চাল-চলনাদির ভাবে বিভোর হইয়া যতই তাহা গ্রহণ করিতে লাগিলেন ততই তাঁহাদের ভাষা, ভাব ও ধর্ম্মকর্ম্মাদি পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। উর্দ্দু, ফার্সী, আরবী ও ভারতীয় ভাষা মিশ্রিত হইয়া হিন্দি ভাষার সৃষ্টি হইল এবং ঐ সকল ভাষার সহিত মিলিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষাও আকৃতিভ্রষ্ট হইয়া একপ্রকার ভগ্ন ভাষায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে কালের পুস্তকাদি দলিল-পত্র সমূহ এই ভগ্ন ভাষাতেই লিখিত হইয়াছে। সে সময়ে দেশবাসীর পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহারাদি মুসলমানদের সদৃশ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই চাল-চলন

এই দেশকে তাঁহাদের অভিরুচি মতে পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তখন আবার এদেশের লোকের ভাব, ভাষা, ধর্ম্ম ও ধারণা সমূহ বৈদেশিক সভ্যতার দিকে ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইতে লাগিল। দেশবাসীরাও বুঝিয়া লইলেন যে, মোসলেম আমলে যে ভাবে তাঁহাদের চাল-চলনাদি রূপান্তরিত হইয়াছিল, ইংরেজ আমলে আবার সেই রূপ ঘটিবে। দেশ ও দেশবাসীরাও নিশ্চিত করিয়া লইল যে, এইবার এতদ্দেশীয়, ভাষা, ভাব ও ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি সমুদায়ই ইংরেজী ভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইবে।—এইরূপ সরল ও পরিবর্ত্তনশীল বিশ্বাসই ধর্ম্মশৈথিল্যের পরিচায়ক এবং পতিত হইবার পূর্ব্বলক্ষণ! সেই কারণে, জগতের কোন জাতি ইউরোপ আমেরিকাদি ভ্রমণকালে জাতীয় পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ না করিলেও এই গোলামবুদ্ধি জাতি সে কার্য্যে চিরপ্রসিদ্ধ।

এই সময়ে স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, বঙ্গভাষাকে ভগ্ন ভাষা হইতে উদ্ধার করিয়া, এক স্বতন্ত্র ভাষায় গঠিত করিবার মানসে, সংস্কৃত ভাষার ছায়া এবং রামায়ণ মহাভারতের কল্পনাদি ভাব সমূহ গ্রহণ করিয়া কতিপয় পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। তাঁহার আন্তরিক উদ্দেশ্য এইরূপই ছিল।—(১) যাহাতে দেশবাসীরা প্রাচ্যভাবে গঠিত হইয়া প্রাণকে পাপশূন্য ও জীবনকে সন্ন্যাসীর ন্যায় উদার ও হিংসাদ্বেষ বিবর্জ্জিত করিতে পারে। (২) যাহাতে তাহারা অন্যান্য জাতীয় চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার আদি পরিচ্ছদসমূহ গ্রহণ না করে এবং যাহা যাহা গ্রহণ করিয়াছে, সে সমুদায় ত্যাগ করিয়া স্বকীয় পূর্ব্ব-পুরুষদের মত শান্ত, উদার, সরল, সত্য ও শুদ্ধ প্রেমময় ভারতীয় ভাব অবলম্বন করিতে পারে (৩) এবং যাহাতে ইহারা চঠিজুতা ও ধুতি-চাদরে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। (৪) যাহাতে সকল ব্যক্তিই ধর্ম্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যবাদী, সুকর্ম্মী, জ্ঞানগর্ভী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বহুদর্শী হইয়া হিংসা-দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব সংস্থাপন করিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে। (৫) যাহাতে কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই সমাজের নিকট হইতে তুল্য সুখভোগের অধিকারী ও অধিকারিণী হইতে পারে।

মনের উক্ত ধারণা সকল, বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় গ্রন্থ সমূহে, জ্বলন্ত চিত্রে অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভাষা উত্তম হইলেও নভেলের ন্যায় শ্রুতিমধুর হয় নাই; গল্পাদি কল্পনা সকল পুরাতন ও নগণ্য বলিয়া গৃহীত হইল। এ সময়ে দেশবাসীদের চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার আদি মোসলেম ধরণে গঠিত ছিল, সেহেতু তাঁহারা প্রাচ্য চাল-চলনের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং তাহা এককালে বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং তাহার পুনরুত্থানের পক্ষপাতীও ছিলেন না, অধিকন্তু তাঁহারা

বহিস্তত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া, এককালে অন্তস্তত্ত্বের তত্ত্ববাদী হইয়া থাকা উত্তম মনে করিলেন না। এই সকল কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা ও ভাব সমূহ তাঁহাদের নিকট আদর প্রাপ্ত হইল না।

অন্যদিকে বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, ইংরাজি ভাব ও ভাষায় বিভোর হইয়া দেশকে ইংরাজী ধরণে গঠিত করিবার মানসে কতিপয় সুন্দর গল্পবিশিষ্ট নভেল লিখিলেন। নভেলগুলির আদিরসাশ্রিত ভাষা অতি মনোমুগ্ধকর ও শ্রুতিমধুর এবং বচনবিন্যাস সকল তেমনি চমৎকার ও স্মৃত্যপোহা হইল, কিন্তু এই বিদেশীয় আদিরস, এতদ্দেশীয় বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিদিগের ভাব-ভরা বিশুদ্ধ আনন্দময় আদিরসের মত অস্থিভেদী, মর্ম্মাকর্ষী ও হৃদয়মুগ্ধকর হইয়াছে কি ?— ঠাকুরের গ্রন্থগত কল্পনাগুলি অতি জটিল ও জঘন্য, অসার ও ভাবশূন্য, হিজিবিজিতে পরিপূর্ণ হয় নাই কি ? লেখার সামঞ্জস্য কোনস্থলে আছে কি ? কবির অঙ্কিত চিত্রগুলি অদ্ভুত রকমের নহে কি ? তিনি (১) ভীরু ও কাপুরুষকে সাহসী ও দাম্ভিক করিয়া আঁকিয়াছেন। (২) অশিষ্টাচার দস্যুদিগকে ধর্ম্মপরায়ণ মহাপুরুষ বলিয়াছেন। (৩) লম্পটরাজকে পরমহংস, দুষ্টকে শিষ্ট ও শিষ্টকে দুষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। দুষ্ট রমণীদিগকে দেবী করিয়া তুলিয়াছেন। স্বীয় জাতি ও ধর্ম্মগত ব্যক্তিদিগকে নিতান্ত নিন্দনীয়, নর-নিকৃষ্ট পিশাচ, স্বার্থপর ও লোভী করিয়া দেখাইয়াছেন।—মিষ্ট ভাষায় এবং আকার ইঙ্গিতে গালাগালি করিলেও তিনি তাহাতেই তাঁহার পাঠকদিগকে তুষ্ট করিয়াছেন—কবির পুষ্পবন সৌরভমুখী পুষ্পের আকরস্বরূপ হইলেও তন্মধ্যে সর্প ও বৃশ্চিক আদি ডাঁশ-মশার অভাব নাই, যাহার দংশনে লোকের এমন মস্তিষ্কদোষ জন্মায় যে, কোন ঔষধেই তাহা আরোগ্য হয় না। এমনভাবে পঙ্গু ও অকর্ম্মণ্য হয় যে সমগ্র জগৎ ভস্মীভূত হইয়া গেলেও তাহাদের হেলনশক্তি থাকে না। আমরাও অবিকল ঐরূপ পঙ্গু, অকর্ম্মণ্য ও কল্পনা আদি জ্ঞান-গুণে বিবর্জ্জিত হইয়াছি।

কবি যে, কি উদ্দেশে এই নভেলগুলি লিখিয়াছেন তাহা আমরা চিন্তা করিয়া পাই না, তবে প্রিয়দর্শন রঙ্গালয়ের দর্শক সাজিয়া যুবকবৃন্দ যে, পরিমাণ বাক্যবীর চাটুপটু, প্রগলভ, ভ্রান্তিমান, দুষ্টবুদ্ধি, কামবৃত্ত লম্পট, অত্যাচারী ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়া দাঁড়ায় ; এই নভেলগুলি 'প্রাইভেট টিউটাররূপে' সে সমুদায়ের শিক্ষা দান করিয়া থাকে। ইহার পাঠে আমরা যাহা শিক্ষা পাইয়াছি তাহার তালিকা নিম্নে দিলাম।—(১) বাঙ্গালীর প্রাণে মোসলেম বিদ্বেষ সুতীব্রতায় জাগিয়া উঠিয়াছে।

(২) সমগ্রদেশ ইংরাজী আচার, ব্যবহার ও ভাবে বিভোর হইয়াছে। (৩) স্বাধীনা সুন্দরীতে দেশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। (৪) লম্পটলীলার সুপরিপাট্ট পটসমূহ প্রাণে প্রাণে অঙ্কিত হইয়াছে। (৫) হিন্দুর হিন্দুয়ানী আর নাই। এতদ্দেশীয় প্রেম-প্রণালীর প্রতি আস্থা ভ্রষ্ট হইয়াছে। (৬) প্রবঞ্চনা-প্রতারণা ও স্বার্থপরতা আদি যাবতীয় কদর্য্যকার্য্যে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছে। (৭) ছড়ি, চশমা, ঘড়ি ও চেনের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। (৮) হুজুগে মাতিয়া 'বন্দেমাতরম্' রবে দেশকে কাঁপাইতে শিখিয়াছে। (৯) গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে আন্দামান ভ্রমণ করিবার উপায় পাইয়াছে। (১০) কি করিলে তাহার ফল কিরূপ হইবে তাহা উদ্ভাবন করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। (১১) ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য পাগল হইয়া জাতিগত স্বার্থ ভুলিয়া দেশকে উচ্ছন্নে দিতেছে। (১২) যদি কোন নেতা, দেশহিতৈষণার জন্য আহ্বান করেন, তখন তাহারা মনে করে, আনন্দমঠের অভিনয় করিবার জন্য তাঁহাদিগকে ডাকা হইয়াছে। তাঁহারা অভিনয় করিতে প্রস্তুত হইলে, নেতা যদি ভ্রুকুটী দেখান, তখন তাহাদের চাষাড়ে চড় নেতার গালে যাইয়া বসে। (১৩) সত্যধর্ম্ম ধরা হইতে মুছিয়া গিয়াছে। যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা শ্মশানবাসী ভূত-পেত্নীদিগের ভণ্ডামী ভিন্ন আর কিছুই নয়। (১৪) দেশকে ডাইনে খাইয়াছে, বুদ্ধির ভাণ্ডারে কীট ধরিয়াছে, কল্পনা সমূহ আগুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছে। জ্ঞানের নয়নে ছানি পড়িয়াছে। কাকাতুয়ার মত বাকপটুতায় প্রবল শক্তি সঞ্চয় করিয়া কল্পনাহীন, বুদ্ধিহীন উদ্‌ভ্রান্ত সাজিয়া গলাবাজীতে রাজ্য জয় করিতেছে ও সকলকে করাইতেছে। এ পাখীর চঞ্চুতে বেল ভাঙ্গিবার শক্তি নাই, কিন্তু 'পাকা-বেল' বলিয়া হাঁকিলেই তাকে ডাকিয়া বসে। তখন বেল বিক্রেতা 'কে ডাকিল' বলিয়া ভ্রমে পড়িয়া ঘুরিতে থাকে, পাখী কিন্তু কিছুই বোঝে না যে, সেই ঐ ব্যক্তিকে অনর্থক কষ্ট দিতেছে।

২ ✻ মজিলে কুল মিষ্টি হয়? ✻ ২

"মহেশপুরের হরমোহন দত্ত একজন মান্যগণ্য ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহার দুইটি কন্যারত্ন ছিল, বড়টির নাম ইন্দিরা, ছোটটির নাম কামিনী। দশক্রোশ দূরবর্ত্তী মনোহরপুরের এক ধনপতির একমাত্র পুত্র উপেন্দ্রের সহিত ইন্দিরার বিবাহ হইল। ইন্দিরা শেয়ানা হইলেও হরমোহন বাবু তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইলেন না। কেন না

জামাতা উপেন্দ্র উপায় করিতে শেখেন নাই। (নভেল ঠাকুরের হিন্দু সভ্যতা-হন্ত্রী জাল-জটিল কল্পনার আরম্ভ হইল। হরমোহন বাবু একজন মস্ত ধনী এবং ভদ্রলোক, তিনি তবে নীচের ন্যায় কার্য্য করিলেন কেন? এই দৃষ্টান্তে এইরূপ বিবাদ প্রায় ঘরে ঘরেই ঘটিতেছে। পতিত বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই মনে করিতে পারেন যে – 'ইহা বঙ্কিম বাবুর দৃষ্টান্তে ঘটিতেছে না, পতিত জাতির অবস্থাই ঐরূপ।' তাহাতে আমরা বলি,—'যখন যে জাতি অধঃপতিত হইতে থাকে, তখন তাদৃশ জাতির ভিতর হইতে, বঙ্কিমের ন্যায় লেখকের উদ্ভব হয় এবং সেই সকল গ্রন্থের পাঠে, জাতিটি আরও হতবুদ্ধি ও উদ্‌ভ্রান্ত হইতে থাকে।)

"জামাতা উপেন্দ্র ঐ কথা শুনিয়া, মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, গোপনে পঞ্জাব যাত্রা করিলেন। সেখানে যাইয়া, কমিসেরিয়েটে অর্থাৎ সিপাহীদের হাট-বাজার করা, খানসামার কাজ পাইলেন। এ কাজে হিন্দুয়ানী থাক, বা না থাক পয়সা আছে। এ কাজে তিনি অল্প দিনের মধ্যে বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করিলেন। সেই সকল ধন লইয়া সগৌরবে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

"হরমোহন বাবু ইন্দিরাকে আর আটক করিতে পারিলেন না। তিনি ষোলজন বেহারা এবং চারিজন ভোজপুরে দ্বারবান বা রক্ষী সঙ্গে দিয়া, সেই ১৯ বর্ষীয়া রূপবতী ইন্দিরাকে, অলঙ্কারে সুরচিতা করিয়া, তাঁহার শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। (সঙ্গে আপনার লোক কাহাকেও দিলেন না। ভদ্রলোকের মেয়ে, তায় প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে; সঙ্গে লোক যাওয়াটা বুঝি অপমানের কথা?)

"যৌবন-সম্পদে সমুজ্জ্বলা ইন্দিরা, স্বামী-দর্শনে অত্যন্ত চঞ্চলমতী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণয়-প্রবাহ বাঁধ ছাপিয়া উঠিয়াছিল, কেবল লজ্জার জাঙ্গাল ভাঙ্গিতে পারে নাই। দশক্রোশ পথ পর্য্যটন করিলে, তবে শ্বশুরালয়ে পৌছিবেন। এই পথ তাঁহার জন্য সহস্র ক্রোশ হইয়া পড়িল। এই দীর্ঘ পথের মধ্যবর্ত্তী স্থলে 'ডাকাতে কালাদীঘি' নামে এক ভয়ঙ্কর স্থল আছে। সেই অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপী দীঘির পাড়ের নীচে দিয়া জলের ধারে ধারে তাহাদের পথ। সেই দীঘির মধ্যবর্ত্তী স্থলে একটি দোকান আছে। পথিকেরা সেই খানে আসিয়া, জলযোগ এবং ক্লান্তি দূর করিয়া থাকে। (সেটা দোকান নহে ডাকাতদের ফাঁদ।)

(নভেল ঠাকুর, ভদ্রলোকের মেয়ে ইন্দ্রিরাকে এইরূপে তাঁহার পিত্রালয় হইতে ডাকাতপ্রদেশে আনিলেন। আপনার কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না। কেন না ভদ্রলোকের মেয়েকে মাঠে আনিয়া ফেলিতে না পারিলে, সম্রাটী কল্পনা খেলে না।

ঠাকুরের নিকট হইতে শিক্ষা পাইয়া আমরাও ঐ ধরণের নভেল লেখক হইয়াছি। আমাদেরও কথার সামঞ্জস্য নাই, কল্পনার হস্তপদাদি মস্তক নাই, রুচিতে রূপ ছাড়া, জ্ঞান-গুণের স্থান নাই। আমরাও ইতিহাসের কথাকে ছোট কথা মনে করি, অসত্যেতেই মহত্ব দেখিতে পাই, লোকের স্বভাব-চরিত্রাদি বিনষ্ট এবং অনিত্য পরনিন্দায় পুস্তকপূর্ণ করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুসলমান লেখকেরাও মোসলেম রমণীদের সতীত্বের উপর কুৎসিত মসির ছড়া দিতে ছাড়িতেছেন না। কারণ ইহাই একালের পাঠকদের রসনামোহন বিষয়। বঙ্গসাহিত্য যেমন নভেল-ময় সাহিত্য, বঙ্গদেশও তেমনি নভেলগত নায়ক-নায়িকাময় দেশ হইয়া, উভয়ের মধ্যে একটি রুচিষ্য সামঞ্জস্যের সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত করিয়া রাখিয়াছে।

"কালাদীঘির দোকানে আসিয়া, বাহকেরা স্নান-পান করিবার জন্য, তথাকার এক বৃক্ষতলে পাল্‌কী রাখিল, (এবং পাছে ইন্দিরা চুরি যাইতে কোনরূপ বিঘ্ন বা বিলম্ব ঘটে তজ্জন্য তাহারা, দ্বারবান ও বাহকবৃন্দ) কুড়িজন একত্র হইয়া, দীঘির জলে যাইয়া নিশ্চিন্ত মনে ডুব মারিতে লাগিল। ইন্দুমুখী ইন্দিরা একাকিনী পালকীতে বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে, সেই বৃক্ষ হইতে হর্য্যাক্ষাকৃতি, কতিপয় দস্যুমূর্ত্তি 'ঝুপ-ঝাপ' করিয়া নীচে পড়িল এবং পালকী কাঁধে করিয়া সবেগে পলায়ন করিল। অন্যান্য বৃক্ষ হইতে বিস্তর অনলাক্ষ ডাকাত নামিয়া, ইন্দিরার বাহক এবং দ্বারবানদিগকে আক্রমণ করিয়া, তাহাদিগকে পাল্‌কীর অনুসরণ করিতে দিল না।

"বাহকদস্যুরা ইন্দিরাকে দ্রুতপদবিক্ষেপে বহন করিয়া, এক দুর্গম বনমধ্যে আনিল, এবং তথায় তাঁহার অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে এক জলগামছা-বৎ মলিন কানো পরাইয়া দিয়া, বনগর্ভে ছাড়িয়া দিল। (ঠাকুরের ডাকাতেরা, অতি ধর্ম্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ এবং ইন্দ্রিয়বিজয়ী হইয়া থাকে। তাহারা ইন্দিরাকে ঘাঁটাঘাঁটি করিলেও, তাতে তাঁহার কুল নষ্ট হইল না) ইন্দিরার সরস যৌবন এবং টুক্‌টুকে মুখ খানির মর্য্যাদা সেই দস্যুরা কিছুই বুঝিল না, বরং সেই সন্ধ্যাকালে যখন সেই অরসিক দস্যুদল রূপসী ইন্দিরাকে একাকিনী করিয়া বনমধ্যে ফেলিয়া যায়, তখন তিনি আপনাকে অপমানিত মনে না করিয়া, স্বেচ্ছায় তাহাদের পদসেবা করিতে চাহিলেন। কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ ডাকাতবর্গ 'রাম রাম' বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। একটি রাত্রির নিমন্ত্রণও গ্রাহ্য করিল না। (ঠাকুর ইন্দিরার কুলে এই প্রথম বোতল সির্কা ঢালিলেন। এর পর বোতলের উপর বোতল ঢালিলেন, যখন কুলটি মজিয়া টবটবে, বেশ সুমিষ্ট ও স্বজাতির রসনারোচক হইবে, তখন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া

উপেন্দ্রের নিকট পৌঁছিয়া দিবেন। সির্কায়-মজা-মিষ্ট কুলের প্রতিচুম্বনে তখন, তাঁহার রুচির দ্বার খুলিয়া দিতে থাকিবে।)

ইন্দিরা কি মনে করিয়া দস্যুদের সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু তাঁহার সেই মনোরথ পূর্ণ হইল না। দস্যুদের সে সব পাপ সহে না, তাহারা পাপের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করিল। অনেক কষ্টে ইন্দিরার সে নিশা পোহাইল। প্রভাতে উঠিয়া, ক্ষুদ্র বস্ত্রটীতে কটিদেশ ঢাকিয়া, হৃদয় ও পৃষ্ঠদেশ বৃক্ষপল্লবে আবৃত করিয়া এবং দক্ষিণ হস্তে এক শাখাযষ্টি লইয়া, বন হইতে বহির্গত হইলেন; এবং বিজন মাঠ ধরিয়া পথ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। পথে অনেক লোক তাঁহার দিকে লোলুপ নয়নে চাহিয়া রহিল, কেহ কেহ তাঁহার পশ্চাৎ লইল, কিন্তু তিনি সির্কায় মাছি বসিতে দিলেন না। হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা অবিরত মাছি তাড়াইয়া চলিলেন। (যখন ঠাকুর সঙ্গে ছিলেন, তখন ইন্দিরার সতীত্ব নষ্ট করে কে?—এস্থলে যষ্টিরও দরকার ছিল না।)

অনেক পথ চলিবার পর, ইন্দিরার সহিত এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইল, তিনি তাঁহার সমুদায় অবস্থা অবগত হইয়া, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আপন আবাসে লইয়া গেলেন। পরিবার জন্য দুইখানি বস্ত্র দিলেন এবং কয়েক দিন ধরিয়া গৃহে রাখিলেন। (তবে কিনা, ঠাকুরের অনুরোধে, তিনি তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে বা শ্বশুরালয়ে পৌঁছিয়া দিতে স্বীকার করিলেন না। তিনি দয়ালু ব্রাহ্মণ, মনোহরপুর এবং মহেশপুর দুইখানি গ্রামই তাঁহার জানা ছিল। তবে যে কি এমন মানসে তিনি সেই মহাবিপদগ্রস্তা যুবতীকে, তাঁহার গৃহে পৌঁছিয়া দিয়া ইহকাল পরকালের পুরস্কার লইলেন না, পাঠক বুঝিয়া লইবেন।—দয়া করিল কেন, নির্দ্দয়ই বা হইল কেন?—ভাল তিনিই যেন নির্দ্দয় হইলেন, গ্রামে কি আর লোক ছিলেন না? তাঁহারা কি সেই ভদ্রকন্যার প্রতি দয়া করিতে পারেন না? তিনি পাঁচবাড়ী চেষ্টা করিলেন না কেন?—যাহার বলদ কর্দ্দমে পড়ে সে দ্বিগুণ বল করে না কি?)

(ইন্দিরাও সে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সকলেই বলিল, তোমাকে তাঁহারা প্রত্যাখান করিয়াছেন। সেখানে যাইয়া অপমানিত হইয়া লাভ কি? যদি তোমাকে তাঁহারা কুলে লইতেন, অবশ্যই তোমার অনুসন্ধান করিতেন। অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই তোমার ঠিকানা করিতে পারিতেন। সেখানে গিয়া কাজ নাই, আমরা কি তোমাকে সযত্নে হৃদয়ে স্থান দিয়া রাখিতে পারিব না?) যাঁহার বাড়ী গেলেন,

লইলেন যে, তাঁহার জগৎ অন্ধকার। যদি গণিকা রূপেই কাল কাটাইতে হইল, তবে পল্লীগ্রামে কেন, সহরে গিয়া একটা উচ্চদরের লোক লইয়া থাকাই উত্তম।)

৩ ❋ নাম পরিবর্ত্তন। ❋ ৩

"সেই গ্রামের কৃষ্ণদাস বসু নামক একব্যক্তি সপরিবারে কলিকাতায় যাইবেন। ইন্দিরা (ফন্দী খেলাইয়া) ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিলেন, আমাকে উহাদের সহিত কলিকাতায় পাঠাইয়া দাও, তথায় আমার খুল্লতাত আছেন; আমি তাঁহার নিকট যাইব। ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। (ঠাকুরের কি জমকাল কল্পনা।—মাঝে দুই তিনখানি গ্রাম পার হইলেই শ্বশুরবাড়ী কিংবা বাপের বাড়ী পাইবেন, তা' না করিয়া ইন্দিরাকে via calcutta করিতে বসিলেন। একপক্ষে পতিত জাতির চক্ষে ধূলি দিতে ঠাকুর যেমন ওস্তাদ, অন্যপক্ষে অধঃপতিত জাতিও ধূলিলোচন হইতে ততোধিক ইচ্ছুক।—ইন্দিরার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কুমুদিনী রাখিলেন; দেখাইলেন যে তাঁহার দস্যুসংসর্গও স্পৃহনীয়, তিনি আর কুলের কেহই নহেন। ঠাকুর সকল কথাই বলিলেন, কিন্তু কলিকাতায় কেন যাইতেছেন, তাহার আসল কথাটা লুকাইয়া, হিন্দুসমাজের সহিত ভাড়ামী করিতে লাগিলেন।—ঐরূপ কত ইন্দিরা যে কলিকাতায় আসিয়া কুমুদিনী হইয়া আছে, ঠাকুর না বলুন, সে কথা সকলেই জানেন। আর ঐ ব্রাহ্মণটি কৃষ্ণদাসের নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়াছিলেন কি না, তাহাও সকলে অনুমান করিতে পারেন।)

"ইন্দিরা কৃষ্ণদাস বাবুর সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া ভবানীপুরে উঠিলেন। কলিকাতায় আসিয়া, খুল্লতাতের ঠিকানা বলিতে পারিলেন না। ঠাকুর তখন ন্যাকামী করিয়া বলিতে লাগিলেন।—ইন্দিরা লেখাপড়া জানিতেন অথচ তাহার ধারণা ছিল কলিকাতা একটি গণ্ডগ্রাম, কিন্তু আসিয়া দেখিলেন—মহানগর, কোটার [illegible]। খুল্লতাতের ঠিকানা পাওয়া গেল না, (পোষ্টপিওনরাও বলিতে পারিল না।) ইন্দিরা অগত্যা কৃষ্ণদাসের বাড়ীতে রহিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে কৃষ্ণদাস বাবু সপরিবারে কাশী যাইতে চাহিলেন। তাঁহার পত্নী ইন্দিরাকে স্থানান্তর দেখিতে বলিলেন। (পেটভাতের দাসী, সঙ্গে করিয়া কাশী লইয়া গেলেন না কেন? পাঠক, অবশ্যই এখানকার রহস্যটা বুঝিয়া থাকিবেন। ঠাকুর ইন্দিরার কুলে, বোতল বোতল সির্কা ঢালিতেছেন, কিন্তু এমন গভীর [illegible],

পতিতবুদ্ধি পাঠকদিগকে তাহা জানিতে দিতেছেন না। ইহাই ঠাকুরের বাহাদুরী।)

অবশেষে ইন্দিরা তাঁহার নাম ধাম পরিবর্ত্তন করিয়া, বাঁদীপনা করিতে প্রস্তুত হইলেন। সুভাষিনী নাম্নী এক গৃহস্থা-বৌ, তাঁহাকে রন্ধন-কার্য্যের জন্য নিযুক্তা করিলেন। সুভাষিনীর স্বামীর নাম রমণবাবু। তিনি একজন উকিল। তাঁহাদের বাড়ীতে আরও দুইজন ঝি ছিল। (ঠাকুর তাঁহাদের রান্নাশালা এবং ঝিদের ছবিগুলি বেশ পরিষ্কার আঁকিয়াছেন। ঐ সর্ব্বনেশে চিত্রগুলিই আমাদের কাল হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ঠাকুরের চিত্র দেখিয়া বুদ্ধিবিলুপ্ত হইয়া পড়ি, আর পাঁদাড় দিয়া বিড়াল আসিয়া পায়রা লইয়া পলায়।)

সুভাষিনীর বাড়ীতে আসিয়া ইন্দিরা ওরফে কুমুদিনী, কতক পরিমাণে স্বীয় মনোদুঃখ লাঘব করিলেন। সুভাষিনীর শিশুছেলেটি কুমুদিনীকে শাশুড়ী বলিয়াছিল, সেই সূত্রে সুভাষিনী তাঁহাকে বেইন বলিতে লাগিলেন। একদিন সুভাষিনী, কুমুদিনীকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তাতে তিনি তাঁহার পিতার নাম ও গ্রাম প্রকাশ করিলেন, কিন্তু পোষ্টাফিস বলিলেন না। ঠাকুর বলেন, তিনি জানেন না। 'ঠাকুর এই সরস গ্রন্থখানি' ইন্দিরাকে দিয়া লেখাইয়াছেন, তথাপি বলেন তিনি হাবা-গোলা মেয়ে।—ঠাকুরের ইচ্ছায় কি না হয়!—দুদিন পরে এই ইন্দিরা কামাক্ষ্যার বিদ্যাধরী হইবেন। যখন বাড়ী হইতে বাহির হন, তখন ইন্দিরার বয়স ছিল ১৯ বৎসর, কলিকাতায় আসিয়া সেই বয়স ১৬ বৎসর হইয়াছে। ঠাকুরের ইচ্ছায় না হয় কি! বিশেষতঃ ইন্দিরা যে মানসে কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাহাতে বয়সটা একটু কম করিয়া দেখান উচিত।)

সুভাষিনী বুঝিতে পারিলেন যে ইন্দিরা বড় ঘরের মেয়ে। তিনি তাঁহার কথা রমণবাবুর কর্ণগোচর করিলেন। রমণবাবু বলিলেন,—"তবে বুঝি উহারই স্বামী—মনোহরপুরের উপেন্দ্রবাবু আমার একজন মোয়াক্কেল।" তখন স্বামী ভার্য্যায় অনেক কথা হইল। পত্নীর অনুরোধে রমণবাবুর প্রাণে দয়ার উদয় হইল। তিনি একদিন উপেন্দ্রবাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে আনিলেন।

সকলে আহার করিতে বসিলে, কৌশলী সুভাষিনী, কুমুদিনীকে পরিবেশন করিতে পাঠাইলেন। পরিবেশন করিতে করিতে উপেন্দ্রের সহিত কুমুদিনীর চোখোচোখী হইল। কুমুদিনী উপেন্দ্রকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু উপেন্দ্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।—চিনিতে না পারুন, সেই অপরিচিতা সেবিকাকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিতে ভুলেন নাই।—আহারান্তে উপেন্দ্র যখন বাড়ী হইতে চলিয়া যান,

কুমুদিনী তাঁহাকে আর একচোখ দেখিয়া লইলেন এবং দেখাও দিলেন। এই দৃষ্টান্তেই কি, ইদানীন্তন বাবুরা নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাইয়া তথাকার রমণীদিগের প্রতি চোরাচোখে চাহেন না? এইরূপ নভেল যে, আমাদিগকে কিরূপ শিক্ষা দেয়, শিক্ষিত ব্যক্তিরা সে দিকে লক্ষ্য করেন কি? এবং এইরূপ দুষ্ট-শিক্ষায়-শিক্ষিত-ব্যক্তিদের দ্বারা, দেশের কোন উপকার হইতে পারে কি না, সে চিন্তা কোন মাথায় উদয় হয় কি?

"কুমুদিনী সুভাষিনীকে উপেন্দ্রবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাহাতে কুমুদিনীকে প্রশ্ন করিলেন। "উনিই কি তোমার স্বামী উপেন্দ্রবাবু?—উনিই বটে তো!" কুমুদিনী বুঝিতে পারিলেন যে, সুভাষিনীর মত হিতৈষিণী তাঁহার আর কেহই নাই। "বলিলেন 'আজ রাত্রি, যাহাতে উঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়,—তাহা তোমাকে করিতে হইবে।" যখন স্ত্রী এবং পুরুষ, তখন দোষ নাই বিবেচনা করিয়া, সুভাষিনী সে কথায় সানন্দে স্বীকৃতা হইলেন।

"রমণবাবুর কৌশলে, উপেন্দ্রবাবুর সন্ধ্যাহারটিও তাঁহার বাটীতেই হইল। এবং হঠাৎ এক পীড়ার ভাণে, উপেন্দ্রবাবু, সে রাত্রি রমণবাবুর বহির্ব্বাটিতেই রহিয়া গেলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি, কুমুদিনীর নিকট হইতে একখানি প্রেমপত্র পাইয়াছিলেন। —তাতে লেখাছিল।—"আমি আপনার পদসেবার অনুরক্তা, অনুগ্রহ করিয়া অদ্য রজনী এই বাড়ীতে থাকিবেন, এবং শয়নকালে দুয়ার খুলিয়া রাখিবেন।" উপেন্দ্রবাবু পত্র-প্রমাণ কার্য্য করিলেন।

সুভাসিনী, কুমুদিনীকে উত্তমরূপে, বেশভূষা পরাইয়া, এবং নানা প্রকার উপদেশ দিয়া, তাঁহাকে উপেন্দ্রের শয়নগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। কুমুদিনী নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে তথায় যাইয়া দেখিলেন দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং পালঙ্কের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, পূর্ব্বকথা এবং নিজের অবস্থার কথা মনে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উপেন্দ্র বলিলেন,—"তুমি আপনি আসিয়াছ, তবে কাঁদ কেন?" তখন কুমুদিনী নয়নজল মোচন করিয়া উপেন্দ্রের সহিত কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন,—"আমার বাড়ী কালাদীঘি, আপনার বাড়ীও সেই অঞ্চলে, আপনার নিকট বাড়ীর সংবাদ জানিতে আসিয়াছি। (বাড়ীর সংবাদ জানিতে হইলে কি প্রথম একটু কাঁদিতে হয়! না, ইহা ছলনাময়ীদের খেলা। পাঠক, এখানে কুমুদিনীর পত্রের সহিত তাঁহার কথার সামঞ্জস্যের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন।)

উপেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। এবং রূপ দেখিয়া

যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিলেন।—কালাদীঘিতে যে এমন সুন্দরী জন্মিয়াছিল তাহা আমি কখনও শুনি নাই। (প্রেমালাপ কি আলো জ্বালাইয়া হইতেছিল?—উপেন্দ্র কালাদীঘিতে পরিচিত কি না?)

ঠাকুরের কৃপায় কুমুদিনী তখন, সির্কায় মজিয়া টবটবে হইয়াছিল। পাকা প্রেমিকার ন্যায় বলিলেন। "আমি কি আপনার স্ত্রী অপেক্ষাও সুন্দরী?" উপেন্দ্র একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার স্ত্রীর দুর্ভাগ্যের কথা কুমুদিনীকে খুলিয়া বলিলেন। কুমুদিনী সকল কথা শুনিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি আপনার স্ত্রীর আর কোন সংবাদ পাইলেন না?" উপেন্দ্র উত্তর করিলেন—"না।"

কুমুদিনী উপযাচিকা হইয়া, অভিসারিকা রূপে, উপেন্দ্রের নিকট গিয়াছিলেন। সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না। যতদূর জিজ্ঞাসা-পড়া হইল, তাহাতে এই পর্য্যন্ত জানা গেল যে, উপেন্দ্র সেই দস্যুস্পর্শিতা স্ত্রীকে পাইলেও গ্রহণ করিবেন না; তিনি দ্বিতীয় সংসার এখনও পর্য্যন্ত করেন নাই, এবং যদি কুমুদিনী তাঁহাকে বিবাহ করেন, তিনি তাহাতে আনন্দিত হইবেন। (অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্রমতে দস্যুস্পর্শিতা স্ত্রী, চাকরাণী অপেক্ষাও নিকৃষ্টা।—আবার দেখিবেন কিছুক্ষণ পর ঠাকুর বলিবেন।—দস্যুরা আদালতে কবুল করিয়াছে তাহারা ইন্দিরাকে স্পর্শ করে নাই, সেইহেতু উপেন্দ্র তাহাকে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবেন না।)

কুলেনজা কুমুদিনী, সির্কামিশ্রিত মধুর ভাষায়, উপেন্দ্রের রুচির দ্বার, এরূপ কোশাদা করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি কথায় কথায় শপথ করিয়া বলিলেন। "তুমি চিরকালই আমার হৃদয়েশ্বরী হইয়া থাকিবে।" (পাঠক, এমন মনে করিবেন না যে, উপেন্দ্র তাঁহারই স্ত্রীকে হৃদয়েশ্বরী করিতে শপথ করিলেন। পরন্তু এ কার্য্যে তাঁর মান সম্ভ্রমের হানি হইতে পারে না।—এখানে নভেল ঠাকুর, কৌশলের সহিত হিন্দুকে দিয়া, এক চাকরাণীকে হৃদয়েশ্বরী বলাইয়া, প্রমাণ করিতেছেন যে, হিন্দুরা রূপমুগ্ধ জাতি। এই দৃষ্টান্তে বর্ত্তমান স্কুল-কলেজের ছেলেরাও রূপ-মুগ্ধ হইয়াছে; তাহারা এখন, হিন্দুর বিবাহ-পদ্ধতির পবিত্রতা নষ্ট করিয়া নানারূপ পাপের কালিমায় কলঙ্কিত হইতেছে।)

পরিশেষে, উপেন্দ্রবাবু কুমুদিনীকে স্বীয় বাসায় লইয়া গেলেন। এবং দুইজনে কতিপয় দিন সেখানে রহিলেন। কুমুদিনী কিরূপ ময়না হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ঠাকুর তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। পাছে উপেন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ না করেন তজ্জন্য কুমুদিনী তাঁহাকে কয়েক দিন ধরিয়া পরীক্ষা করিলেন। অর্থাৎ তাঁহার

সহিত একাসনা হইলেন না। (ঠাকুরের কথা কে অবিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হইবে?) যখন কুমুদিনী বুঝিতে পারিলেন যে, উপেন্দ্রের পক্ষচ্ছেদ হইয়াছে; আর তিনি কুমুদিনীকে ফেলিয়া উড়িতে পারিবেন না তখন তিনি তাঁহার সহিত একাসনা হইতে লাগিলেন। (আমরা সম্রাটী কৌশলে পড়িয়াই মাটি হইলাম।)

অল্পদিনের মধ্যে উপেন্দ্রবাবুকে বাড়ী যাইবার পত্র আসিল। তখন উভয়েই এক মহা চিন্তায় পড়িলেন। কুমুদিনী পরামর্শ দিয়া বলিলেন,—"আমাকে সঙ্গে লইয়া চল; সেখানে পরিচয় দিবে, 'ইন্দিরাকে পাওয়া গিয়াছে।' আমিও বলিব 'আমি ইন্দিরা।" (এইরূপ বলিলেই কি বর্জ্জিত নারী সমাজে স্থান পাইবে?)

উপেন্দ্র বলিলেন, "পরিচয় দিবার সময়, তুমি অবিকল বলিতে না পারিয়া, ধরা পড়িয়া যাইবে।" কুমুদিনী বলিলেন, "আমি মায়াবিনী, আমি সব জানি, কোন কথায় ঠকিব না।" উপেন্দ্র তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন, তিনি সকল কথার স্বরূপ উত্তর করিলেন। এমন কি বাসরঘরে উপেন্দ্র ইন্দিরায় যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহাও বলিয়া দিলেন। উপেন্দ্রের ধাঁধা লাগিয়া গেল। (এই ধাঁধার নাম সম্রাটী ধাঁধা, এই ধাঁধাই পাঠকগণকে ধাঁধাসঙ্কুল করিয়া রাখিয়াছে। এই ধাঁধা এক প্রশ্নে কাটিয়া যাইত, সম্রাটঠাকুর উপেন্দ্রকে, সেই ধন্ধধর্ব্বী প্রশ্ন করিবার অনুমতি দিলেন না। প্রশ্ন এই।—"তোমার পিতা তোমাকে কন্যা বলিয়া স্বীকার করিবে কেন?"—এ প্রশ্ন করিলে তৎক্ষণাৎ সম্রাটি আক্কেল গুড়ুম হইয়া পড়িত, এই পর্য্যন্ত লিখিয়া তাঁহাকে লেখনা পরিত্যাগ করিতে হইত।—কিন্তু ঠাকুর আপন আক্কেল বজায় রাখিয়া পাঠক সকলের আক্কেল গুড়ুম করিয়া দিয়া, হিন্দুদের মাথায় হাত দিয়া বুঝাইয়া দিলেন।—'বল দেখি তোমরা কেমন উদভ্রান্তজাতি, রূপ দেখিলে, ছল-কৌশল দেখিলে, তোমরা রমণীদের গোলাম সাজ কি না? তাহাদিগকে দেবী মনে করিয়া তাহাদের চরণামৃত গ্রহণ কর কি না? আর তোমরা সর্ব্বথা পর-স্ত্রী-কাতর কিনা? স্বার্থ তোমাদের ধর্ম্ম কিনা?)

উপেন্দ্র বলিলেন, "তোমার স্বামী আছে, সে যদি আসিয়া তোমার দাবী করে?"

কুমুদিনী, "আমি তাহাকে চিনি না, সেও আমাকে চেনে না।" তারপর কুমুদিনী অন্য রূপে বলিলেন,—"কামরূপে আমার অধিষ্ঠান, আমরা বিদ্যাধরী, অপরাধ করিবার কারণে অভিসম্পাতগ্রস্ত হইয়াছি, তাই পাচিকা এবং কুলটাবৃত্তি করিতে হইতেছে।" (আপন মুখে কুলটা স্বীকার করিলেও ইন্দিরা সম্রাটী কল্পনায় সতী।)

থাকে। কল্পনার এমন বাহার কোথাও দেখি নাই। পাঠক! কুমুদিনীকে আপনি ইন্দিরা মনে করেন কি?—সে হাবা-বোবা মেয়ে ছিল, কলিকাতা গণ্ডগ্রাম মনে করিত, কালাদীঘি হইতে বাড়ী যাইবার পথ পাইল না, পোষ্ট আফিসের নাম জানিত না। আর কুমুদিনী যে ওস্তাদ মেয়ে,—না জানি কত ওস্তাদ সেবিয়া তবে, এতদূর ওস্তাদী ফলাইতে শিখিয়াছেন।—আবার দেখিবেন ইনি মেঘ-ঝড়ের সঙ্গে বিজলী হইয়া আকাশে উড়িবেন।)

৪ * কুমুদিনীর কুলপ্রাপ্তি * ৪

উপেন্দ্র কুমুদিনীকে লইয়া দেশে আসিলেন। এবং তাঁহাকে মাহেশপুরে পাঠাইয়া দিয়া, নিজে মনোহরপুরে গমন করিলেন। পরদিন সমারোহে শ্বশুরবাড়ী, আসিলেন কামিনীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "কাল একটা ডাকিনী পালকী করিয়া আসিয়াছিল। সে ঐ দেবমন্দিরে ঢুকিল। ক্ষণকাল পরে মেঘঝড় হইল। সে বিজলী হইয়া উড়িয়া গেল। দেশপর্য্যটক উপেন্দ্র তাহাই বিশ্বাস করিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। সেখানে বিস্তর স্ত্রীলোক জুটিয়া অনেক প্রকার রং ঢং সং করিল। কেহ মোগল সাজিয়া উপেন্দ্রকে চমৎকৃত করিল। কেহ বা ভিখারিণী সাজিয়া উপেন্দ্রের নিকট হইতে কিছু আদায় করিল। (বেল্লুরী কল্পনার আবর্ত্তনে) এই সকল রং ডং সং আর সংস্কৃতের ঢং রং পং দেখাইয়া ঠাকুর বলিলেন,—এই সকল কুচাল আগে এ দেশে প্রচলিত ছিল, এখন আর নাই, যদি কোনস্থলে থাকে তবে তাহাদের চক্ষুদান করিবার জন্য এই অভিনয় দেখান হইল। (হিন্দু মধ্যে, ঐরূপ কুচাল অনেকই ছিল। সে সকল উঠিয়া যাইবার পর ঠাকুর তাহার নিন্দা করিতেছেন।—এখনও যাহা চলিতেছে, ঠাকুর তাহার নিন্দা করিতে পারিলেন না, বরং সাপেক্ষতা করিয়া গিয়াছেন।—ঠাকুরের যদি সে বিচার শক্তি থাকিত তাহা হইলে প্রথমতঃ, তিনি নিজের নিন্দনীয় গ্রন্থগুলি, না পোড়াইয়া পরলোক গমন করিতেন না। সে বুদ্ধি থাকিলে ইন্দিরাকে আবার কুলে গ্রহণ করিবার ইঙ্গিত করিতেন না।—ঠাকুর! আপনার সুচারু কল্পনার দ্বারা আপনার সমাজ ও সম্প্রদায়, যেরূপ উপকৃত হইয়াছেন, তাহা তাঁহারা ইহকালে ও-পরকালে পরমসুখে ভোগ-দখল করিবেন।—ইহকালের ভোগটা চোখে চোখেই দেখিতেছি। যেন পরকালের ভোগ আর আমাদের দেখিতে না হয়।—আর আপনার জ্ঞাতিবর্গেরা,

আপনার গ্রন্থগুলির সত্ব বেচিয়া, বাড়ীর বালাই তাড়াইয়া ভালই করিয়াছেন।)

যাহা হউক হিন্দুসমাজকে কিছু উৎকোচ দিয়া, ইন্দিরাকে ঠাকুর, কুলে তুলিয়া লইলেন। (তাই ভাবি, যদি ইন্দিরা দরিদ্র-কন্যা হইত, তবে; ঘুস দিতে না পারিয়া তাহাকে অকুলে ভাসিতে হইত কি না? যদি রূপবতী না হইত, তবে তো উপেন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করিতেন না? তাঁহাকে চিরকালই কুমুদিনী হইয়া থাকিতে হইত। —ঠাকুর তাঁহার পুস্তক সমূহে জলন্ত ভাষায় প্রমাণ করিয়াছেন যে,—হিন্দুর সমাজ বল ধর্ম্ম বল ও সতীত্ব বল সমস্তই অর্থে বিক্রয় হয়।—সম্রাটী আক্কেল খেলাইয়া, ঠাকুর যেরূপ, প্রকারান্তরে কেন, স্পষ্টাক্ষরে অসহ্যজনক কুলবিনাশক কথায় হিন্দুদিগকে বিশেষিত করিয়াছেন,—কোন মুসলমান স্বীয় ধর্ম্ম ও সমাজকে ঐরূপ বিভূষিত করিলে, তাহাকে তাহারা বকরাইদের দিন কোর্ব্বান না করিয়া ছাড়িত না।—কিন্তু সাবাস হিন্দুদের ধৈর্য্যশীল প্রাণ, ধীর এবং সুশীতল বুদ্ধি! তাঁহাদের মার্জ্জনা শক্তি দেখিয়া সত্য সত্যই আমরা বিস্ময়াপন্ন হই। তাঁহাদের পবিত্র অন্তঃকরণে এমন এক সুশীতল স্রোতস্বতী বহিতেছে যে, জগতে এমন অনল নাই, যাহা তাহার সংস্পর্শে নির্ব্বাপিত না হয়।—এই জন্য ইংরেজ রাজার প্রয়োজন হইলে, সহজেই হিন্দুদের দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া দেন, হিন্দুরাও তাহাতে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করেন না।)

বাঙ্গালায় সুলেখক কে?—যাহারা লোকের কুৎসা করিতে মুক্তমুখ, যাহাদের কল্পনার হাত-পা নাই; যাহারা পাঠককে উদ্‌ভ্রান্ত ও উচ্ছন্নগামী করিতে মহামেধাবান; যাহারা নিজের গ্লানিকর কথা নিজেরাই অতিরঞ্জিত করিতে পারে, যাহাদের লেখার ও কথার সামঞ্জস্য নাই; যাহারা সুপথগামীদেশকে কুপথগামী করিতে পারে; যাহারা ভাষাকেই জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধি বলিয়া মনে করে; তাহারাই সুলেখক। আর, যাহাদের লেখার হাত পা আছে, কল্পনায় জ্ঞানলাভ করা যায়, যাহারা সত্যের পক্ষ লইয়া গ্রন্থ লেখে এবং যাহাদের কথার সামঞ্জস্য থাকে; তাহারাই কুলেখক। উৎকোচপ্রিয় সংবাদ পত্রের দোষে এবং সর্ব্বগ্রাসী (বিশেষ করিয়া মুসলমান) পুস্তক বিক্রেতার কৃপায়, এ দেশে সুলেখক জন্মিবার নহে। ইহারাই সাহিত্য-কাননের প্রকৃত কীট। অন্ধসাহিত্যসমাজে এ সকল কীট দেখিতে পান না। তাঁহারা সভা করিয়া নিজেদের গৌরব ঘোষণা করেন মাত্র। আর কেহই দেখিতে পায় না যে, একমাত্র সাহিত্যের দোষে, এদেশের নৈতিক দোষ জন্মিয়াছে, এবং এই দোষ থাকিতে ইহারা কখনই উন্নতি করিতে পারিবে না। এই জন্যই